সিগন্যাল

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

এপিক প্রেস

৩০ কলেজ রো। কলিকাতা-৯

॥ আড়াই টাকা ॥

প্রচ্ছদপট। সুবোধ দাশগুপ্ত

ডি, এন, প্রেস, ৩০ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত, এবং এপিক প্রেস,
হইতে এ, কে, বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সিগন্যাল

॥ অন্যান্য গ্রন্থ ॥

একটি নদী দুটি তীর

জলসঙ্গিনী

কত জন কত মন

শুভরাত্রি

এই আলো এই ছায়া

দীপমহল

স্বর্ণসন্ধ্যা

॥ এক ॥

নন্দনপুর জংসন ষ্টেশন। চার নম্বর প্লাটফর্মে একখানা ট্রেন এসে থামল। ট্রেনখানা কলকাতা থেকে আসছে। গালভরা দাড়ি আর ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড় পরণে একটি মানুষ ট্রেন থেকে নামল। অন্যান্য যাত্রীদের ভিড় থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে সে ওভারব্রিজটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সসঙ্কোচ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে ষ্টেশনের সবকিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, আর যেন কি এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে তার চোখ-মুখের চেহারা রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছিল।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে নিখিল ফিরে এল নন্দনপুরে। এই পাঁচ বছরে ষ্টেশনটার চেহারাটা যে এতটা বদলে যেতে পারে, তা সে ইতিপূর্বে কখনও কল্পনাই করতে পারে নি। হুইলারের বুক ষ্টল থেকে সুরু করে ষ্টেশনারি দোকান, রেষ্টুরেন্ট, পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা ওয়েটিং রুম, ভেণ্ডার, কুলি বা যাত্রীর ভিড়ে জমজমাট প্লাটফর্ম, মালগাড়ীর সান্টিং, নতুন নতুন ষ্টাফের কর্মব্যস্ততা—সবকিছুই তার চোখে বিস্ময়ের আর কৌতুহলের বিষয় বলে বোধ হতে লাগল। পাঁচ বছর আগে এসব কিছুই ছিল না। তবু নন্দনপুর ষ্টেশনকে কাছাকাছি অনেকগুলো ষ্টেশনের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হত একটি বড় জংসন ষ্টেশন বলে।

টিকেট-কলেকটর, ট্রেন-এক্সামিনার, পয়েন্টম্যান, সিগন্যালম্যান, এ-এস-এম—সব নতুন মুখগুলো তার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিল। আর সে শুধু তাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই ছিল। অনেকক্ষণ সেইভাবে বসে থাকার পর সে হঠাৎ আবিস্কার করল একটি চেনা মুখ। মনে হল, প্লাটফর্মের এক ধারে গামছা পেতে বসে খৈনী টিপছে যে হিন্দুস্থানী পোর্টারটা, সে নিশ্চয়ই লক্ষ্মণ সিং! ওই তো ঠিক তেমনি চেহারাটি। চোখ দুটো কোটরগত, গালের চোয়াল দুটো বসে-যাওয়া, সৌখীন কাঁচা-পাকা গোঁফ, আর দু কানে দুটো পিতলের রিং ঝুলছে।

নিখিল লক্ষ্মণ সিংয়ের নাম ধরে ডাকতেই লোকটা উঠে এল তার কাছে।

—কি বলছ ?

—আমায় চিনতে পাচ্ছিস্ নে, লক্ষ্মণ ? আমি তোদের ছোটবাবু !

লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণতর করে তার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বের করতে চেষ্টা করল। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠল, ছোটবাবু । ওঃ, আপনে সেই পুরাণা ছোটবাবু আছেন ? লেকেন চিনবার মত সুরৎ রাখিয়েছেন কি ? আ-হাঃ, এ কি সুরৎ করিয়েছেন ?

নিখিল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাস স্বরে বলল, পাঁচটি বছর কয়েদ খেটে ফিরলাম। চেহারার আর দোষ কি, বল ? তারপর, তোদের খবর ভাল তো ?

—হাঁ ছোটবাবু, ভাল। লেকেন চাকরি করছেন তো আবার ?

—পাগল ! কোম্পানি আর চাকরি দেয় ?

নিখিল উদাসভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—হ্যাঁরে, বড়বাবু কি বদ্‌লি হয়ে গেছেন ?

—না, বদ্‌লি হোয়েন নি, ইখানেই আছেন ।

—দিদিমণির কোন খবর জানিস্ ?

লক্ষ্মণ সিং দিদিমণির কথায় একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। মনে মনে কি যেন ভাবল। তারপর ইতস্ততের সুরে বলল, দিদিমণি।......দিদিমণি ভি আছেন। লেকেন—

—কি বলছিস্, বল ! থাম্‌লি কেন, লক্ষ্মণ ?

—দিদিমনি চলতে পারেন না।

নিখিল চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করল, কেন ?

—কেনে আবার ? সেই যে এক্‌সিডেন হোইয়ে গেল, সেই থেকে হাসপাতালে দিদিমণির একঠো পা কাটিয়ে ফেলল।

নিখিলের দুর্বল মাথাটা যেন টলে গিয়ে সে পড়ে যাচ্ছিল। কি নিদারুণ দুর্ঘটনা ! তবু—তবু সুরমা আজও বেঁচে আছে। আজও তার কাছে সব কথা খুলে বলবার সুযোগ নিখিলের ফুরিয়ে যায় নি। সেই জন্যেই যে সে দীর্ঘ পাঁচটি বছরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে তারপর ছাড়া পেয়েই ছুটে এসেছে নন্দনপুরে। সে লক্ষ্মণ সিংকে প্লাটফর্মের ওপর ফেলে রেখে দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে ছুটতে

ছুটতে গেল ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়ার্টারের দিকে। পেছন থেকে বিমূঢ় বিস্ময়ে লক্ষ্মণ সিং বার দুই চেঁচিয়ে উঠল, ছোটবাবু, কোথায় যাইতেছেন—ছোটবাবু……

কিন্তু বৃথাই সে ডাকছিল। নিখিল ততক্ষণে গুড্‌স্‌ ট্রেনের সান্টিং লাইনগুলো পার হয়ে গেছে ছুটতে ছুটতে। কোয়ার্টারগুলোর ভেতর সুরকির রাঙা পথ ধরে সে এগিয়ে চলছে হনহন্‌ করে বড়বাবুর কোয়ার্টারের দিকে।

পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ্দুরের প্রলেপ এসে ছড়িয়ে পড়েছিল ষ্টেশন মাষ্টার রাখালবাবুর কোয়ার্টারের সামনেকার সুন্দর ছোট্ট ফুলবাগানটিতে আর এক ফালি বারান্দার ওপর, যেখানে কাঠের পায়ে ভর দিয়ে সুরমা একটু একটু চলে ফিরে বাগানে চাকরের জল দেওয়ার তদারক করছিল।

চোরের মত বাগানের এক কোণে এক গাল দাড়ি নিয়ে ছিন্ন পোষাকে নিখিলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাকর বনমালী তাকে পাগল মনে করে জিজ্ঞেস করল, এই—তুই কি করছিস্‌ ওখানে দাঁড়িয়ে ?

—বনমালী আমায় চিনতে পাচ্ছো না ? আমি তোমাদের ছোটবাবু।

—ছোটবাবু ? সে আবার কে ?

বিরক্তিভরে চেঁচিয়ে উঠল বনমালী। পাঁচ বছর পরে নিখিলের পরিবর্তিত চেহারায় তাকে চিনতে না পারারই কথা।

কিন্তু বারান্দা থেকে শিউরে উঠল সরমা।

—কে ? কে ওখানে, বনমালী ?

—কে জানে, কে একটা পাগল কোথা থেকে এসে ঐখানটায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিখিল এরই মধ্যে ফটকের সামনে এগিয়ে এসেছে।

—সরমা, আমি নিখিল।

—কে ?

সরমা অতি সন্তর্পণে কাঠের পা দুখানা নামিয়ে রেখে বারান্দার ওপর বসে পড়ল। তার মাথাটা টলে পড়ছিল হয়তো। সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে মুখখানা তুলে নিজের দেহমনের সব

শক্তি একত্রিত করে সে দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিখিলের শ্রীহীন বিবর্ণ মুখ নাকে ঠাহর করে দেখতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সরমার দু চোখ ভরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। মানুষটার সেই সুশ্রী চেহারাটা আগুনে পুড়ে যেন খাঁক হয়ে গেছে। নিখিলের অপরাধীর দৃষ্টিতে তার প্রানের সবখানি কারুণ্য যেন ঝরে পড়ছে। তবু তাকে ক্ষমা করা চলে না। সরমার বিক্ষুব্ধ মন তার মুখে রূঢ় ভাষা এনে দিল, কি চাও ?

আশ্চর্য! নিখিল যেন বোবা হয়ে গেছে সরমার সামনে দাঁড়িয়ে। কোন কথা বলতেই সে পাচ্ছে না। পুত্তলিকাবৎ অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে সে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সরমার দিকে। আবার তার দৃষ্টি পড়ল সরমার কাটা পাখানার দিকে। আবারও চমকে উঠল সে। সরমার এত বড় ক্ষতির মূলে সে নিজে রয়েছে। না, না, তা হতে পারে না। এমন কাজ সে কেমন করে করতে পারে!

এতদিনের অনাহারে অনিদ্রায় তার দুর্বল মাথায় সবকিছু যেন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। আবার সে যেন একটা ধাক্কা খেল সরমার পুনরাবৃত্ত প্রশ্নে, 'কি চাও'!

সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে এবং একান্ত আকস্মিকভাবেই নিখিলের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েকটিমাত্র কথা বেরিয়ে এল, কিছু চাই না। শুধু তোমায় একটিবার দেখতে এসেছিলাম। আজ সকালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই—

—ও: !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সরমা।

—সরমা, আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে? সেই দুর্ঘটনার জন্যে আমি দায়ী নই, সরমা অমি এখনও কিছুই—

—না না না না, তুমি চলে যাও এখান থেকে, তোমার মুখ দেখাও পাপ। তুমি আমার পরম শত্রু। মানুষের আদালতে তোমার শাস্তি হয়েছে। কিন্তু ভগবানের দরবারে তোমার শাস্তি এখনও বাকি! তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল সরমা। কাপড়ে মুখ ঢাকল। তারই মাঝে নিখিল নিশ্চিতভাবে দেখতে পেল যে, সরমার চোখে মুখে ঘৃণা ও প্রতিহিংসার বহ্নিছায়ার রেখাপাত সুস্পষ্ট।

কিছুক্ষণ ধরে আপন মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সরমা যখন মুখ তুলে তাকাল, নিখিল তখন চলে গেছে।

প্লাটফর্মের ওভারব্রিজের তলায় চুপটি করে অপরাধীর মত বসে নিখিলের মনে পড়ছিল পুরনো দিনের কত কথা। তন্ময় হয়ে পড়েছিল সে। চমকে উঠল সে লক্ষ্মণ সিংয়ের কথায়।

—ইখানে এমন চুপটি করিয়ে বসিয়ে আছেন যে? কি হোইলো?

—আচ্ছা লক্ষ্মণ, তুইও কি বিশ্বাস করিস্ যে, সেই ট্রেন-দুর্ঘটনা আমি ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছি? তোর কি মনে হয়? সত্যি কথা বল্—

—ছোটবাবু, সকলেই তো সেই একই কথা বলে। আপ্‌নের সাথে দিদিমনির সাদি হইলো না দেখে দিদিমনির ট্রেনে আপ্‌নে এক্‌সিডেণ্ট করাইয়ে দিলেন। দিদিমনি খোঁড়া হোইয়ে গেল।

—সেই এক কথা। তোদের সবার মুখে একই কথা। বিশ্বাস কর্, লক্ষ্মণ, আমি কিচ্ছু জানি নে। আমি কখনও চাইনি এই এক্‌সিডেণ্ট। আমি চাইনি—

একটা ট্রেন এসে ইতিমধ্যে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। গার্ডের হুইসল ও ষ্টেশনের ঘণ্টা একই সঙ্গে বেজে উঠলে, ট্রেনটা চলতে সুরু করল। হঠাৎ এক ছুটে নিখিল ট্রেনটায় গিয়ে উঠে পড়ল। ট্রেনটা কলকাতাগামী।

কামরাটার একটা কোণে একটি জানলার পাশে গিয়ে বসে নিখিল একটু শান্ত হতে চেষ্টা করল। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার চোখে মুখে স্পর্শ করছিল। অথচ মাথার ভেতরটা তার ক্রমাগতভাবে দপ্‌দপ্ করছিল। একটু ঘুমোতে পারলে হয়তো সে সুস্থ বোধ করতে পারত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিখিল ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাংগল ট্রেনটা কলকাতায় পৌছলে। প্লাটফর্মে নেমে নিখিল ভাবতে লাগল, কোথায় সে যাবে? চেনা-জানা আত্মীয়-স্বজন কে-বা তার আছে? আপন মনে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সে প্লাটফর্মের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছিল। হঠাৎ একটি চেনা মুখ তার নজরে পড়ল। গার্ডসাহেব স্বয়ং। প্রকাশ রায়। তার অনেক দিনের বন্ধু। প্রমোশন পেয়ে গার্ড হয়ে গেছে। সে-ই ট্রেনটাকে নিয়ে এসেছে। প্রকাশকে দেখতে পেয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, প্রকাশ, এই প্রকাশ!

—কে ?

অবাক হয়ে গেছে প্রকাশ পাগলের মত চেহারার লোকটার মুখ থেকে নিজের নাম শুনে। চিনতে পারেনি তাকে।

—কে ?

—জানি, চিনতে পারবিনে ! আমি নিখিল। পাঁচ বছর জেল খেটে এলাম। নন্দনপুরের সেই—

—ও: তুই ? জানি জানি, নন্দনপুরের সেই এক্সিডেন্টের কেসে,—তা, এখন কোথায় আছিস্ ?

—কোথায় আর থাকব ? জানিস্ তো, এত বড় পৃথিবীটায় আপন বলতে কোথাও আমার কেউ নেই !

—কিন্তু আমি তো তোর পুরণো একজন বন্ধু। আমি তো অন্ততঃ রয়েছি। চল্ আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে। এ বেলা খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম কর্। তারপর ও বেলা যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে'খন। তা এখন আসছিস্ কোত্থেকে ?

—নন্দনপুর থেকে। তুই তো সব কথা শুনলি নে ? আগে সব কথা শোন, তারপর বল, আমি অপরাধী কিনা। সরমা আমায় কি বলে জানিস্ ? বলে, আমি নাকি তার পরম শত্রু। পাগল আর কাকে বলে ? আরে, আমি কি কোন মানুষের ক্ষতি করতে পারি ? তুই-ই একটিবার বল্, প্রকাশ, একটিবার—

নিখিল কখনও হো হো করে হেসে উঠল কথা বলতে বলতে। আবার কখনও সে ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণভাবে ফিস্‌ফিসিয়ে প্রকাশের কানের কাছে মুখ এনে কথা বলতে লাগল। প্রকাশ বুঝল যে, সে একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে হয়তো দীর্ঘকাল যাবৎ জেল খাটবার জন্যে, কিংবা মানসিক দুশ্চিন্তাবশতঃ, অথবা নিজের অমার্জনীয় অপরাধের কথা বারবার মনের মধ্যে বিশ্লেষণ করে করে। তাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে প্রকাশ বলল, আচ্ছা, চল্ আমার বাড়ীতে। তারপর ধীরে-সুস্থে সব কথা শুনব।

প্রকাশের স্ত্রী বিনতা নিখিলের জন্যে খুবই যত্নসহকারে রান্নাবান্না করল তারপর দু বন্ধু একসঙ্গে খেতে বসে গেল। খাওয়াটি খুব তৃপ্তির

সঙ্গে সমাধা করে নিখিল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিনতার রান্নার প্রশংসায়।

—হ্যাঁ বৌদি, খুব চমৎকার রান্না হয়েছে। তাছাড়া, এমন যত্ন করে বহুদিন কেউ খাওয়ায় নি। পাঁচটা বছর জেলখানার একঘেয়ে বাজে খাবার খেয়ে খেয়ে নাড়ীটাই যেন শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বৌদি, প্রকাশ আবার কোথায় গেল? আমার সব কথা যে ওকে এখনও বলা হল না?

—ওই তো উনি এসে গেছেন। বোধহয় ঘরের ভেতরে কোন কাজে গিয়েছিলেন। এই নিন আপনাদের পান।

—দিন দিন, একটা পান না খেলে বোধহয় এত খাবার হজমই হবে না!

—এইবার বল্, নিখিল, তোর গল্প শুনি!

—তুই তো জানিস্, প্রকাশ, যে, পুরো সাতটি বছর ধরে আমি ওই নন্দনপুর ষ্টেশনের 'কেবিন এ-এস-এম' ছিলাম। সকলের চেয়ে বয়সে ছোট এবং চাকরিতে জুনিয়র ছিলাম বলে সবাই আমায় ছোট-বাবু বলেই ডাকত। বড়বাবু ছিলেন রাখালবাবু।

—রাখালবাবু তো এখনও ওই নন্দনপুরেরই বড়বাবু রয়ে গেছেন। তাই না?

—হ্যাঁ, রাখালবাবুর মেয়ে সরমা। সাতটি বছর ধরে সবাই জানতো, এমন কি, সরমার মা-বাবা পর্যন্ত স্থির করে ফেলেছিলেন যে, আমাদের দুজনের বিয়ে হবে। কিন্তু কোথা থেকে সরমার মামাবাবু এলেন একদিন সরমাদের বাড়ীতে। সব ওলোট-পালোট করে দিলেন তিনি। আমাদের দুজনের জীবনে যে দুর্ঘটনা তিনি ঘটালেন, তার কাছে নন্দনপুরের ট্রেন-দুর্ঘটনা নিতান্তই তুচ্ছ, বৌদি!

—কেন ঠাকুরপো, এমন কি ঘটল?

—বৌদি, একটি রাতের কয়েকটি মুহূর্ত আমাদের জীবনে যে-বিচ্ছেদ রেখা টেনে দিল, কোন দিন কি ভুলতে পারব আমরা সে-কথা?

চুপ করে রইল নিখিল। স্তব্ধতায় থম্‌থম করছে তার চোখ-মুখ। পলকহীন শূন্য দৃষ্টিতে সে যেন খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে পাঁচ বছর আগেকার তার নিষ্কলঙ্ক জীবনের মধুর স্মৃতিগুলিকে। তন্ময় হয়ে ধ্যানে বসেছে যেন সে। আর প্রকাশ এবং বিনতা দুজন নিরব শ্রোতা ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে তাকিয়ে রয়েছে তার প্রশান্ত মুখখানার দিকে, তার অসাধারণ জীবন-কাহিনী শোনবার আগ্রহে।

॥ দুই ॥

পাঁচ বছর আগে কি নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি মধুর জীবন ছিল নিখিলের। একটি ছোট্ট কোয়ার্টারে নির্বিবাদে কত সহজ ও নির্ভেজাল আনন্দে দিনগুলো তার কাটত। কেবিনম্যান দয়ারামও তাকে কিছু কম ভালবাসত না। সে-ও ছিল যেন নিখিলের ব্যক্তিগত জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সে-সব দিনের কথা ভাবতে ভাবতে জেলের বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে সে তন্ময় হয়ে যেত।

এক-একটা দিনের স্মৃতি ছবির মত স্পষ্টভাবে আঁকা রয়ে গেছে নিখিলের বুকের ভেতরের নির্মল পটে। সে ছিল 'কেবিন এ. এস. এম.' আর দয়ারাম ছিল তারই কেবিনম্যান। তার বয়স তেইশ বছর, আর দয়ারামের পঞ্চাশের কাছাকাছি। তবু তারা দুজনে যেমন অফিসে ছিল উপরোস্থ ও অধীনস্থ কর্মী, আবার ব্যক্তিগত জীবনেও তেমন মনিব-ভৃত্যেরও অধিক। দুজনের মধ্যে এমন মধুর সম্পর্ক ছিল যে, যখন তারা কেবিনে ডিউটিতে থাকত, তখন চাকরিটাকে তাদের চাকরি বলেই মনে হত না। কেবিনটাকে মনে হত তাদের কোয়ার্টারের মতই প্রিয়।

মনে পড়ে নিখিলের সেই কেবিনটির কথা। দেয়ালে একটি ক্লক। সারি সারি সিগন্যালের চাবি। সবুজ আলো। সুইচ-বোর্ড। ঘরের কোণে ছোট্ট একটি টেবিল ও একখানা চেয়ার। তার পাশে টরে-টক্কার মেসিনটিতে ট্রেনের খবরাখবর সদাসর্বদা লেগেই ছিল। টেবিলের ওপর কিছু খাতা-পত্তর। ঘরের আর একটি কোণে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো গুটিয়ে রাখা একটি সবুজ নিশান। সেটি দয়ারাম কেবিনের জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ব্যবহার করে, যখন থ্রু ট্রেনগুলো হু-হু করে নন্দনপুর ষ্টেশন কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলে যায়।

খবর আসে, ৩৬ নম্বর ডাউন ট্রেন আসছে। নিখিল দয়ারামকে হুকুম দেয় দু নম্বর প্লাটফর্মে লাইন ক্লিয়ার দিতে। দয়ারাম সিগন্যাল

টেনে ডাউন করে। মেইন লাইনের জোড়ার মুখে চাবি টেনে ঠিক দু নম্বর প্লাটফর্মের লাইনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ট্রেনটা এতক্ষণ দূরে দেখা যাচ্ছিল। এবার ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। যাত্রীদের ওঠানামা, কুলিদের তৎপরতা, ভেণ্ডারদের হাঁক এবং অদূরে অন্য লাইনে মালগাড়ীর সান্টিং প্রভৃতি নিয়ে কর্মব্যস্ত নন্দনপুর জংশনের একটি জমজমাট চিত্র সিগন্যাল-কেবিনের ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে নিখিল স্পষ্ট-ভাবে দেখতে পায়। আর এই অভ্যস্ত ও অতিপরিচিত দৃশ্যটি তার চোখে কখনও পুরোণো বা ক্লান্তিকর বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যে মেইন ষ্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বার হুকুম এসে গেল। নিখিলের নির্দেশানুযায়ী দয়ারাম ট্রেনটার ছাড়পত্র ঘোষণা করল। ট্রেনটা আবার চলতে সুরু করল।

এমনি করে এক-একটি ট্রেন যায়, আর নিখিলের কাজের ভার ক্রমশঃ কমে আসে। তার আট ঘণ্টার ডিউটির মধ্যে যতগুলো ট্রেন চলাচল করবে তাদের সবকিছু খুঁটিনাটি খবর তার মুখস্ত।

নিখিল তাকাল একবার দেয়াল-ঘড়িটার দিকে। বার তিনেক পায়চারি করল কেবিনের মধ্যে। কেবিনের জানলা দিয়ে দেখা যায় অদূরে রেল-কলোনীর দীঘিটা। বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্দুরে দীঘির পাড়ের নারকেল বনের মাথা চিক্‌চিক্ করে। দীঘির ঘাটে আসে কেউ স্নান করতে, কেউ-বা জল নিতে। আসে বড়বাবুর মেয়ে সরমাও। বিকেল বেলায় দীঘির বাঁধানো ঘাটে দাঁড়িয়ে সখীদের সঙ্গে কথা কয়, আর আড় চোখে দু-একবার তাকায় কেবিনটার দিকে। তার চোখ দুটো সেখানে কি অথবা কাকে যেন খোঁজে। কেবিনের জানলায় যদি সে দয়ারামের সেই থ্রু ট্রেন পাস্ করানো সবুজ নিশানটা নিখিলের হাতে দুলতে দেখে তো বুঝতে পারে যে, নিখিল ডিউটি শেষ হলেই চলে আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে। খুসী মনে সে ঘরে ফিরে যায়।

দয়ারাম সব সময় নিখিলের সবুজ নিশানের সিগন্যাল দেখতে পায় না নিজের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে। নিখিলের পায়চারি লক্ষ্য করে সে তাই উঠে গিয়ে কেবিনের জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দীঘির ঘাটে কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে বলে, আপনার শরীরটা কি ভাল নেই, ছোটবাবু? বড্ড ছট্‌ফট্ করছেন যে।

—না না, শরীর ভালই আছে। মোহন এখনও আসছে না কেন, তাই ভাবছি।

মোহনও একজন কেবিন-এ. এস. এম। নিখিলকে এসে সে রিলিফ করবে।

দয়ারাম বলে, তেনার তো আসবার সময় এখনও হয় নি? তিনি তো পাঁচটায় আসবেন ডিউটিতে। এখন তো মাত্র চারটে চল্লিশ বেজেছে।

—কিন্তু মোহনকে আজ একটু সকাল সকাল আসতে বলেছিলাম।

—আপনি যান ছোটবাবু, এখন তো কোন ট্রেন নেই। মোহনবাবু এক্ষুনি এসে পড়বেন।

—দূর পাগল! মোহন আসবার আগে পালালে চাকরি চলে যাবে।

—দিদিমণির সাথে দেখা হবে নি এখন না গেলে।

—হুঁ! ভারি তো, দেখা না হল তো বয়েই গেল! উঃ, কি ঝগড়াটে মহিলা তোদের ঐ বড়বাবুর স্ত্রী, মানে, ঐ সরমার মায়ের কথা বলছি-রে!

—ঠিক বলেছেন। বড়-মা খুব রাগী।

—আরে দূর দূর! রাগী না ছাই! ওকে আর রাগী বলে না। ভীষণ ঝগড়াটে, গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে ভালবাসেন। ঐজন্যে তো ওদের বাড়ীতে আজকাল আর যাই নে। দূর! সরমার সঙ্গে দুটো কথা কইব তো সব সময় যেন আড়ি পেতে রয়েছেন। কি যে ছোট মন! আরে, আমি কি, বাপু কিছু চুরি-ডাকাতি করতে গেছি নাকি?

এমন সময় মোহন ও তার কেবিনম্যান মনোহর এসে ঢুকল কেবিনে।

—এই যে এসে গেছিস্! ওঃ, মনোহরও এসে গেছে। চল দয়ারাম, তোরও ছুটি! চল্লাম-রে মোহন!

—আচ্ছা, ভাই!

নিখিল ও দয়ারাম চলে গেল। দয়ারাম মোহনকে সেলাম করে গেল। মোহনও মাথা নাড়ল।

কোয়ার্টারে ফিরে নিখিল পোষাক বদলাল। ছোট্ট একটি ঘর এবং সংলগ্ন একটি রান্নাঘর। শোবার ঘরটিতে ছোট্ট একখানা খাট। একটা

আলনায় কিছু জামা-কাপড়। একটি ছোট্ট তোরঙ্গ। একটি ছোট্ট টেবিলের ওপর কিছু বই-খাতা। একখানি ফোল্ডিং চেয়ার। একটি হারিকেন। দেয়ালে টানানো স্বামী বিবেকানন্দের একখানা ছবি। দেয়ালের অন্য দিকে তাকের ওপর ছোট্ট একটি টাইম-পিস্। তার পাশে একটি বাঁশের বাঁশী। বাঁশী বাজানো নিখিলের ভারি সখ। সময় পেলেই সে আপন মনে বাজায় বাঁশী। গানও সে গায়। তবে তা নিজের রচনা, ও তাতে নিজের সুর-সংযোজনা।

দয়ারামের কোয়ার্টার অদূরেই। সে ছোটবাবুর রান্না-বান্না বা অন্যান্য সবকিছুর তদারক করে। সে-ও তার কোয়ার্টারে একলা থাকে। তার দেশের বাড়ীতে থাকে তার ছেলে-বৌ। মাসে মাসে মণি অর্ডারযোগে সে তাদের টাকা পাঠিয়ে দেয়। তাই নন্দনপুরে ছোটবাবুর সংসারের মানুষ হয়েই সে দিন কাটায়।

•

নিখিল চুল আঁচড়াচ্ছিল চিরুণী দিয়ে, এমন সময় দয়ারাম মুড়ি-জল-খাবার আর চা নিয়ে এল।

—কি-রে, এর মধ্যে চা তৈরী হয়ে গেল?

দয়ারাম খুসীর হাসি হাসল। খুব তাড়াতাড়ি কোন রকমে চা পান করে নিখিল ছুটে বেরিয়ে গেল।

ষ্টেশনমাষ্টার রাখালবাবুর কোয়ার্টারের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। কোয়ার্টারটির সামনে ছোট্ট বাগানটির পাশে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিতেই বড়বাবুর চাকর বনমালী বেরিয়ে এল। নিখিলের মুখের দিকে সতর্কপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল, ছোটবাবু, মাঠাকরুণ এই ঘরের মধ্যে রয়েছেন।

—তাই নাকি? দিদিমণি কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে!

—দূর মিথ্যেবাদী! এই তো দেখলাম, পুকুরঘাট থেকে জল নিয়ে এল। এরই মধ্যে—

—ছোটবাবু, সিগ্রেট আছে? সিগ্রেট?

—আছে! নিজে ধূমপান না করলেও তোমায় ঘুষ দেবার জন্যে আমায় সিগারেট কিনতে হয়। এই নাও!

নিখিল পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে দিলে বনমালী খুসী মনে সেটি হাতে নিয়ে বলল, ছোটবাবু, দিদিমণির ঘুম ভেঙে গেছে। এখন সে চুল বাঁধছে।

নিখিল মুখ ভেংচে বলে উঠল, 'ঘুম ভেঙে গেছে, চুল বাঁধছে'! যাও, এবার খবরটি দাও গিয়ে। আর শোন, তোমার মা-ঠাকরুণটি যেন জানতে না পারেন যে. আমি এসেছি। তাঁকে কোন কাজে একটুক্ষণ ব্যস্ত রেখ। সরমার সঙ্গে আমার একটু জরুরী কথা আছে।

—জরুরী কথা। নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করছি!

হাসতে হাসতে বনমালী আরও বলতে লাগল, একবার মা-ঠাকরুণের বাপের বাড়ীর গল্প তুলতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। ঘণ্টা খানেকের জন্যে আমারও কাজের নিশ্চিন্তি। সেই বাপের বাড়ীর গল্প তো আর যা-তা ব্যাপার নয়, একেবার অষ্টাদশ পর্বের মহাভারত। শীগ্‌গির আর শেষ হচ্ছে না।

নিখিল কৌতুকভার গলায় জোর দিয়ে বলল, এই নাও আর একটা সিগারেট।

এবার বনমালী নত হয়ে প্রণাম করে সিগারেটটি নিয়ে কানে গুঁজে প্রস্থান করল। নিখিলকে বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না। সরমা এসে নিখিলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

—চুপটি করে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? মায়ের ভয়ে? আচ্ছা, তুমি মাকে অত ভয় কর কেন, বল তো? মা কি বাঘ না ভাল্লুক?

—কি জানি কেন, তোমার মাকে আমি ঠিক যেন—

ঘরের ভেতর থেকে সরমার মা মনোরমার কণ্ঠ শোনা গেল।

—ওখানে কে রে, সুমি?

নিখিল সরমার মায়ের গলা শুনে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলে, সরমা তার হাতখানা চেপে ধরল। নিখিল বলল, এই রে, উনি জানতে পেরে গেছেন যে, আমি এসেছি!

—তুমি তো আচ্ছা মানুষ? এ বাড়ীতে রোজ তোমার আসা চাই; কিন্তু মায়ের সঙ্গে একটু ভাব করে নিতে পার না?

কথাগুলি বলে সরমা একটু দুষ্টুমির হাসি হাসল। নিখিলের সংকোচ

তবু যেন যেতে চায় না। চোখ বড় বড় করে সে বলল, ওরে বাবা, তা আমি পারব না!

আবার মনোরমার কণ্ঠ শোনা গেল।

—কথা কস্ নে, কেন? কে ওখানে?

—নিখিলদা এসেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে।

—ইস্। কি যে কর? এখন কি করি, বল তো?

মনোরমা আবার চেঁচিয়ে বললেন, তা বেশ তো, এখানে পাঠিয়ে দে-না!

সরমা খুসী হয়ে উঠল। কিন্তু নিখিল সত্যিই ঘাব্ড়ে গেল মনোরমার আহ্বানে। সরমা তাকে টানতে টানতে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

মনোরমার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে নিখিল মনটাকে সংযত করে নিল।

•

ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে গাদা গাদা সুপুরি কাটছিলেন মনোরমা। গালে পান। স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটি মুখের জোরেই বসে বসে সংসার চালাচ্ছেন। কারণ নিজের পায়ে বাতের ব্যথা প্রায়ই লেগে আছে। তাই বেশী চলাফেরা কিংবা কাজকর্ম তিনি করতে পারেন না। সৌখীন মেজাজের চাকর বনমালী ও ঠিকে ঝি সুরবালাকে দিয়ে স্বামী-কন্যাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসারটির খুঁটিনাটি কাজকর্ম কোন রকমে চালিয়ে নেন। কোন অসুবিধে নেই।

আপাততঃ নিখিলকে দেখতে পেয়ে বললেন, এস বাবা, বস!

নিখিল ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ছোট্ট ঘরখানার এক পাশে একখানি খাট। খাটের পাশে একটি আলমারি। টেবিলের সামনে দুখানা চেয়ার। তারই একটা চেয়ারে নিখিল বসে দেখতে পেল যে, খাটের তলায় একটা চৌকীর ওপর রয়েছে একটা হারমোনিয়াম ও এক জোড়া ডুগি-তবলা। আর এক পাশে একটি আলনা এবং একটি সেলাইয়ের কল। এ ঘরে নিখিল এই প্রথম ঢুকল। তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ঘরখানার চারদিকে।

সরমা এসে বসেছিল তার মায়ের পাশে। মনোরমা সরমার মুখের

দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিখিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ শুনে খুব খুসী হলাম।

—হ্যাঁ মাসিমা, আপনার পায়ের বাতের ব্যথার কথা শুনলাম। কেমন আছেন এখন ?

—কার কাছে শুনলে ? সরমার কাছে ?

—না, মানে, মানে, ঐ বনমালীর কাছে।

—ব--ন--মা--লী--র কাছে ?

—হ্যাঁ, মানে—

—ও, তা ভাল করেছ !

—আমি বলছিলাম কি, আমার জানা একজন খুব ভাল কবরেজ আছে, তার বাতের তেল অব্যর্থ ! যদি বলেন তো একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—না না, তোমার বাপু ওসব কিছুই করতে হবে না। বাতের অসুখের কথা আমার দাদাকে লিখেছি। দেখো-না, দাদা কি করে ?

—হ্যাঁ, শুনেছি আপনার দাদা মস্ত বড় একজন ডাক্তার।

—ছাই শুনেছ। কিচ্ছু শোন নি। দাদা ডাক্তার হতে যাবে কোন্ দুঃখে ? হাজার গণ্ডা ডাক্তারকে নিত্যি চরিয়ে বেড়ায় দাদা। বুঝলে ?

খুব অবাক হওয়ার ভঙ্গী করে নিখিল মনোরমার খুব ঘনিষ্ট হয়ে ওঠার আশায় চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করল, সে কি রকম ?

গর্বের হাসি হেসে মনোরমা নিজের স্থূলাকৃতি দেহটাকে একটু নেড়ে চেড়ে বললেন, দাদার যে ওষুধের মস্ত বড় কারবার। কত গণ্ডা ডাক্তার তো দাদারই চাকরি করে।

নিখিল মুখে এখন অসাধারণ আনন্দের এতখানি আধিক্য ফুটিয়ে তুলল যেন এমন সাংঘাতিক রকমের একটা প্রয়োজনীয় ও আশ্চর্যজনক খবর না জেনে সে অনেকখানি অপরাধ করে ফেলেছে। বলল, তা তো জানতাম না ?

মনোরমারও কথা বলার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। বাপের বাড়ীর গল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে যখন একবার, তখন কতক্ষণে এবং কি ভাবে যে এ প্রসঙ্গের ইতিরেখা টানা হবে, কে জানে ! বনমালীর কথাগুলো

নিখিলের মনে পড়ে খুব হাসি পাচ্ছিল। এক্ষুনি হয়তো সুরু হবে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের কাহিনীকীর্ত্তন।

সত্যিই তাই হল। মনোরমা অচিরেই বাপের বাড়ীর গল্প সুরু করলেন।

—দাদা কি আর যে-সে মানুষ? কলকাতায় পদ্মপুকুরে দাদাকে কে না চেনে? তিন তিনবার কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হতে দাঁড়িয়েছিল। কি ভোটাভুটির কুরুক্ষেত্তোর ব্যাপার। সেবারে বাপের বাড়ীতে থেকে স্বচক্ষে দেখলুম। সে একেবারে টাকার ছড়াছড়ি।

—ওঃ, উনি কাউন্সিলারও বুঝি?

—অ্যাঁ? তা, কাউন্সিলার হতে আর পারল কই? আজকালকার লোকগুলো সব পাজি। টাকা খেলে দাদার, আর ভোট দিয়ে এল গণেন মল্লিককে। যত সব—

সরমা এতক্ষণ চুপ করে বসে একবার তার মায়ের মুখের দিকে, আর একবার নিখিলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। দুজনের মধ্যে গল্প বেশ জমে উঠেছে দেখে সে খুসী হয়ে উঠে বলল, মা, নিখিলদার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আসি!

মনোরমার তখন আর কোন দিকে মন দেবার ফুরসুৎ ছিল না। বাপের বাড়ীর গল্প শোনবার মত একজন মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে তিনি আত্মবিস্মৃত অবস্থাতে সরমার কথার উত্তরে বললেন, তা যা-না!

পরমুহূর্তেই তিনি আবার সুরু করলেন, তারপর শোন, নিখিল, দাদা বললে, 'আমি কি আর টাকার পরোয়া করি? ভোটে তো আমি দাঁড়াচ্ছিলাম না, খাবার ছড়িয়ে কাক-চিলগুলোর তামাসা দেখছিলাম।

নিখিল মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে এনে বলল, ভারি মজার মানুষ তো মামাবাবু?

ইতিমধ্যে বনমালী চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে পেছন এল সরমা। বনমালী চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে মনোরমার অলক্ষে হাতখানা নিখিলের দিকে বাড়াল আর একটি সিগারেটের জন্যে। নিখিলও গোপনে ও অতি সন্তর্পণে নিজের খালি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিল যে, আর সিগারেট নেই। বনমালী মুখে একটি বিশেষ ধরণের ভাব প্রকাশ করে আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

সরমা এবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে বলল, নিখিলদা, একটা গান গাও-না।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নিখিল বলল, আজ থাক আর একদিন হবে।

—না, আজই! সেই যে সেই গানটা—'তুমি কথা তুমি সুর, তুমি গান তুমি প্রাণ'—সেই গানটার অর্ধেকটা আমার তোলা হয়েছে, বাকিটা—

—এ গান তুমি কোথায় শুনলে?

—কেন, সেই বিজয়া-সম্মিলনীর জলসায় তুমি গেয়েছিলে।

—আশ্চর্য! সেই একবার শুনেই তুমি—

—বেশ তো নিখিল, তুমি গাও-না একখানা গান। তবে ওসব ছাই-পাঁস নয়, একখানা শ্যামাসঙ্গীত কিংবা কীর্তন গাও তো শুনি।

—নিখিলের মুখখানা এবার ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

—শ্যামা সঙ্গীত!

—হ্যাঁ বাবা, রামপ্রসাদী গান আমার বেশ লাগে। দাদা-বৌদি যত রেকর্ড কিনেছে, তার প্রায় বার আনাই তো রামপ্রসাদী। দাদা আবার স্বামী বিরজানন্দের শিষ্য কিনা।

আবার বাপের বাড়ীর কথা এসে পড়ছে দেখে নিখিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছিল। কারণ দাদা-কাহিনীতে সে ইতিমধ্যেই শ্রান্তি বোধ করছিল। নিখিলের নিরুপায় ভাব,লক্ষ্য করে সরমা চোখের ইঙ্গিতে তাকে উৎসাহ দিল এবং ব্যক্ত করল যে, সে যেন তার মাকে না চটায়। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে হারমোনিয়ামটার সামনে গিয়ে বসে এক কলি গাইল—'আর কত ঘুরাবি মা গো!'—তারপরই কাসি—ভীষণ কাসি—

—তোমার কি কাসি হয়েছে নাকি, নিখিল? নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে।

—হ্যাঁ, ঠাণ্ডা লেগেই—

এমন সময় আপনভোলা ভালমানুষ রাখালবাবু কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।

—কার কাসি হয়েছে? আর কার বা ঠাণ্ডা লেগেছে? তোমার?

তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আ মরণ, আমার হতে যাবে কেন? দেখছো, নিখিল কাসছে, জিজ্ঞাসা করছ আমায়?

—নিখিলের কাসি হয়েছে। তা, নিখিল এতক্ষণ আমায় বলে নি কেন? দাঁড়াও, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিচ্ছি এক ডোজ্, এক্ষুণি সেরে যাবে। নিয়ে আয় তো মা আমার ওষুধের বাক্সটা।...

সরমা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ছোট্ট একটি বাক্স এনে তার বাবাকে দিল। মনোযোগসহকারে রাখালবাবু এক পুরিয়া ওষুধ বের করে নিখিলের হাতে দিয়ে বললেন, চট্ করে খেয়ে নাও, দেরী করো না।

নিখিল মুখের মধ্যে ওষুধটা ফেলে দিল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

– আজ যাই!

—যাও, কিন্তু দেখো, যা কাসছো, তাতে আবার নতুন করে ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগিয়ে বসো না যেন!

নিখিল ঘাড় কাত্ করে বেরিয়ে গেল। মনোরমা আবার সুপুরি কাটায় মন দিলেন। রাখালবাবু ওষুধের বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। কিন্তু সরমা উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানলাটার কাছে। সেখান থেকে দেখা যায় নিখিলের চলে-যাওয়া। রেল-কলোনীর সেই সুরকি বাঁধানো পথের এ পাশে রেল-লাইন আর গুড্স ট্রেনের ঠাসাঠাসি, আর ওপারে ওভারব্রিজের ওদিকটায় ষ্টেশন। ষ্টেশনের পেছনে ছোট্ট শহর, বাজার, দোকান, পিচের রাস্তা, সাইকেল রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী। আর আছে স্কুল, হাসপাতাল, সিনেমা, ধানকল, গমকল, তেলকল। মানুষের ভিড় আর কোলাহলে প্রাণপূর্ণ নন্দনপুরের ছবি। কিন্তু রেল লাইনের এপারে শুধুমাত্র রেল-কলোনী। আর রেল-কলোনীর আরও ওদিকে ছোট্ট একটি পড়ো মাঠ। সবুজ ঘাসে আর সাদা ঘাসফুলে বোঝাই ছোট্ট একটা বিলই বরং তাকে বলা চলে। সেদিকে তাকিয়ে সরমার সময় বেশ কেটে যায়। বিলটার মধ্যে সে খুঁজে পায় মনের অনেকখানি মুক্তি। রেল-লাইনগুলো আরও দূরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ আর অস্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন দূর বাগানের সঙ্গে মিশে যেখানে একাত্ম হয়ে গেছে, সেইখানে কুয়াসাচ্ছন্ন পরিবেশে নিজের মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে সে উদাস হয়ে পড়ে। অবশ তন্ময়তায় শিথিল হয়ে যায় তার দেহমন। তবু সে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েই থাকে।

নিখিল অনেকক্ষণ আগেই তার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে নিজের কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। তবু সরমা সেদিক থেকে যেন চোখ আর ফেরাতে পাচ্ছিল না। সারা পথটা মাড়িয়ে নিখিল যেন রেখে গেছে তার স্পর্শের মহার্ঘ মাধুর্য ঐ নির্জন পথটার সকটুকু রাঙিমার মাঝখানে। আপন মনে সে নিখিলের গানটা গুনগুন করে গেয়ে উঠল—'তুমি কথা তুমি সুর, তুমি গান তুমি প্রাণ'……

চম্‌কে উঠল যেন সে তার মায়ের কণ্ঠস্বরে।

—সুমি, কত বেলা হল, এবার যা তোর বাবার চানের জল গরম হল কিনা, দেখ! উনি তো এক্ষুনি আবার বেরিয়ে যাবেন। বারটার ট্রেন আসবার আগে চান করিয়ে খাইয়ে তৈরী করে দে। এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ যে!

—যাই-মা!

গুনগুন করে গানটা গাইতে গাইতে সে চলে গেল। নিখিলের নিজের লেখা ও সুর-দেওয়া গানটা বেশ! যেমন করেই হোক, বাকিটুকু সে নিখিলের কাছ থেকে শিখে নেবে।

॥ তিন ॥

সন্ধ্যেবেলায় নিখিল নিজের কোয়ার্টারে বসে হারিকেনের আলোতে গান লিখছিল, আর গলায় সুর তুলছিল। প্রথম লিখল।

'আলো চাই, আশা চাই'—

সুর করে গাইতে নিজের কানেই বেশ লাগল। তারপর লিখল,

'জীবনের পথে বাঁচার মত এতটুকু ভালবাসা চাই।'

এবার সে সুর করে গাইতে লাগল গলা ছেড়ে। দয়ারাম একখানা থালায় খান চারেক রুটি, একটু ডাল আর আলু-পটলের একটুখানি তরকারি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরের মেঝেয় আসন পেতে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে তাকে খেতে দিল। নিখিল তখনও গানের কলি রচনা নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত।

দয়ারাম এবার শাসনের ভঙ্গীতে বলল, ছোটবাবু, খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল?

—এই যাই! আর একটু—

—ওসব পরে করবেন! আগে খেয়ে নিন!

নিখিল গাইল দু পংক্তি গান। দয়ারামের চোখ-মুখ উজ্জল হয়ে উঠল গান শুনতে শুনতে।

—ঠিকই বলেছেন ছোটবাবু, মানুষের দয়া-মায়া-স্নেহ-ভালবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

—তাই মানুষে আর মানুষে মনের গ্রন্থিতে সন্ধি হওয়া চাই।

নিখিল গাইল—

'মানুষে মানুষে হোক্ সন্ধি,
হৃদয়ে থেকো না কেউ বন্দী,
নতুন সূর্য ঐ উঠেছে দেখো,
তার সাত রঙে রাঙা জীবনের অমর ভাষাই।
আলো চাই, আশা চাই ॥'

—ভারি সুন্দর গানটা তো!

—দেখি, এবারে খেয়ে নিই! ওরে বাবা, এ যে একেবারে রাজভোগ সাজিয়েছিস্, দেখছি!

—খেতে খেতে বাকিটুকু রচনা করে ফেলুন, ছোটবাবু! আশ্চর্য আপনার মাথা!

—হুঁ! খুব ভাল লেগেছে তাহলে?

—খু—ব!

দয়ারাম হারিকেনটা নামিয়ে নিখিলের সামনে রাখল। তারপর উৎসুক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একখানা রুটি থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে ভেজানো দরজাটার দিকে তাকিয়ে নিখিল গাইল—

'বন্ধ দুয়ার খোলো,
হিংসা দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ ভোলো।'

দয়ারাম উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে ফিরে এসে বসল। এক ঝলক হাওয়া এসে ঘরে ঢুকল। নিখিলের নজর পড়ল যে, ঘরের পাশের ছোট্ট বাগানটি থেকে উঠে এসে জানলার গরাদ ডিঙিয়ে অপরাজিতা ফুলে-ভরা একটা লতাগুচ্ছ ঘরের ভেতর উঁকি দিচ্ছে। সে আবার গাইল—

'জীবনকে করো মধুময়,
ফুলের মত যেন সে হয়,
চেয়ে দেখো দিগন্তে
হাতছানি দিয়ে ডাকে নতুন উষাই।
আলো চাই আশা চাই॥'

দয়ারাম তখনও মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিখিলের দিকে চেয়ে রয়েছে। হো হো করে নিখিল হেসে উঠে বলল, আর নেই, ফুরিয়ে গেছে গান।

—ফুরিয়ে গেল? কি সুন্দর গানটা! গলায় তো আমার সুর নেই, তা নইলে আপনার কাছ থেকে একটু শিখে নিতাম। বড্ড গাইতে ইচ্ছে করছে কিনা!

—তা গাইবি! মানুষকে মানুষ বলে সত্যিই যদি কখনও ভালবাসতে পারিস্ তো এই গানই তুই গাস্, দয়ারাম।

—আর একখানা রুটি এনে দিই, ছোটবাবু?

—না-রে এগুলো গিলতে পারি কিনা, তাই আগে দেখ।

—এমন করে আর কতদিন কাটাবেন, ছোটবাবু? এবার একটা বিয়ে করুন!

নিখিল তার মুখের দিকে কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বি-য়ে?

তারপর সে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল পান করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল।

—হ্যাঁ, ছোটবাবু, বিয়ে!

—এই সামান্য কটা টাকা তো মাইনে পাই! এতে আমার নিজেরই চলে না তো আবার বিয়ে!

—ও দেখবেন, ঠিক চলে যাবে। বরং ভালভাবেই চলবে।

—তুই একটা বদ্ধ পাগল, দয়ারাম! যা, এবার আবোলতাবোল ভাবনায় মাথা খারাপ না করে খেতে বস্‌গে!

দয়ারাম হাসতে হাসতে চলে গেল। কিন্তু নিখিল হঠাৎ বেশ খানিকটা উদাস ও তন্ময় হয়ে খাওয়া বন্ধ করে কি যেন ভাবতে লাগল। তার সূক্ষ্ম মনটা যেন অন্য কোন জগতে চলে গেছে। সেখানে সে সত্যিই কি ছোট্ট একটি নীড়ের স্বপ্ন দেখছে? আর পাঁচজন সাধারণ সামাজিক মানুষের মত সে কি পারে না একটি নীড় বাঁধতে। বিয়ে করে সংসারী হওয়ার কথা নিখিল তার জীবনে বোধ করি এই প্রথম এমন করে ভাবল।

দয়ারাম খেতে বসেছিল নিজের ঘরে। হাঁটু ভেঙ্গে বসে ঘটি থেকে উঁচু করে ঢেলে সে জল পান করছিল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিখিল তার ঘরে গিয়ে ঢুকে ছোট একখানা টুল টেনে নিয়ে বসল। মেজাজটা যে তার ভারি হাল্‌কা ও খুসী, দয়ারাম তার মুখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারল।

—তোকে 'পাগল' বলেছি বলে রাগ করিস্ নি তো, দয়ারাম?

—কি যে বলেন, ছোটবাবু! আপনার কথায় রাগ করব? আপনার কথায়, আমি তো কোন্ ছার, এই গোটা নন্দনপুরের কোন্ মানুষটা রাগ করবে, শুনি? আপনাকে সকলে খুব ভালবাসে। আপনিও যে সব মানুষকে ভালবাসেন। তাই! আর সে-কথা তো আপনার তৈরী ঐ নতুন গানটার ভেতরেই ধরা পড়ল!

—তা তো বুঝলাম আচ্ছা দয়ারাম, তুই যা-মাইনে পাস্‌, তাতে তোর সংসার তো ভালভাবে না হোক, মোটামুটি একরকম চলে যাচ্ছে, কি বলিস্‌?

দয়ারাম মুখ টিপে হাসল। সে বুঝতে পেরেছে যে, ছোটবাবুর মনে তার সেই কথাটির আঁচড় পড়েছে।

—ভালভাবে আর এই সামান্য মাইনেয় কেমন করে চলবে? তবে ভগবান চালিয়ে দিচ্ছেন কোন রকমে। আর একটা কথা কি জানেন? যে যার নিজের ভাগ্যে খায়। এ জগতে কেউ কাউকে খাওয়ায় না, ছোটবাবু। আপনি যদি বিয়ে করেন তো আপনার স্ত্রীকে আপনার খাওয়াতে হবে না। তাঁর ভাগ্য তিনি নিজেই নিয়ে আসবেন।

—দূর! তোর যত সব—

নিখিল কপট বিরক্তির ভান করে উঠে বেরিয়ে গেল। আর দয়ারাম খেতে খেতে আপন মনে হাসতে লাগল।

বনমালী রেল-কলোনীর পথ ধরে হন্‌হন্‌ করে বাজারে চলেছে সকাল বেলা। হাতে তার বাজারের থলে, মুখে সিগারেট, গায়ে ফতুয়া, পায়ে রবারের শ্লিপার। সৌখীন মেজাজে হাঁটতে হাঁটতে সে শুনতে পেল, একটা চেনা গলা তার নাম ধরে ডাকছে। ডাকছে টিকেট-কলেক্টার শশীনাথবাবু।

বনমালী তাঁর কোয়ার্টারে ঢুকতেই খর্বাকৃতি প্রৌঢ়টি ব্যস্ত হয়ে তাকে আদর-যত্ন করে ঘরে ডেকে নিয়ে খাটের ওপর বসালেন। সবে তিনি দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজা শেষ করেছেন। বনমালী তাঁর কাছে খুবই প্রিয়। তাই সকালবেলায় এক কাপ চা তাকে তিনি প্রায়ই ডেকে খাওয়ান। আর সেই সঙ্গে সিগারেট দুটো-একটা দেন। কারণ তিনি ভাল করেই জানেন যে, বনমালী সিগারেট খুব পছন্দ করে।

বনমালীকে এইভাবে তুষ্ট করার পেছনে একটি ছোট ইতিহাসও আছে। শশীনাথের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও গত হয়েছেন। চতুর্থ পক্ষের জন্যে তিনি বনমালীকে অনুরোধ করেছেন। বনমালীও কথা দিয়েছে যে, তার ভাগ্নীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা সে করবে। প্রকৃতপক্ষে, বনমালীর কোন বোন নেই। শুধুমাত্র চা-সিগারেট খাওয়ার লোভে এবং শশীনাথের

স্তুতিবাক্য শোনবার আগ্রহে সে তাঁকে বহুদিন যাবৎ এই মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আসছে।

ঘরে ঢুকে বনমালী দেখল যে, ষ্টোভে চায়ের জল চাপিয়েছেন শশীনাথ। মনে মনে খুসী হয়ে সে পা তুলে খাটের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল শশীনাথের সেই বিশেষ অনুরোধটির জন্যে।

শশীনাথ তার খুব কাছ ঘেঁসে বসে বললেন, আমার কি করলি, বনো?

—বলেছি তো দিদিকে।

—একটু ভাল করে বলে দেখ্, বনো!

—ভাল করেই তো বলেছি! দিদি এক রকম রাজী হয়েই আছে, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে ঐ জামাইবাবুকে নিয়ে।

—কেন?

—জামাইবাবু বলছে, ও পাত্রকে মেয়ে দেওয়া যাবে না।

—কেন?

—বললে, সামান্য একটা টিকিট-কলেকটার, কতই-বা মাইনে পায়!

—কেন, তুই বলিস্ নি যে, ষ্টেশনে বেরোলেই দশ টাকা?

—তা বলতে কি আর বাকি রেখেছি! আরও বলে, অত বুড়ো পাত্রকে আমার এত কচি মেয়ে দিতে পারব না, ভাই বনো, তুই বরং কোন ছোকরা পাত্র জোগাড় করে আন্।

—কেন, তুই আমার চেহারা-স্বাস্থ্যের কথা বলিস্ নি বুঝি? আমাকে কি কেউ যুবক বলবে না এখনও?

—নিশ্চয়ই বলবে! আমিও কি আর বলি নি? আপনি যা নন, তা-ও বলেছি। হাজার গুণ বাড়িয়ে বলেছি।

—কি রকম?

—বলেছি, দেখতে ঠিক যেন কার্তিক-ঠাকুরটি, ময়ূর ছাড়াই উড়ু উড়ু করছে। আর হাসলে, যেন ঝুরঝুর করে গজমুক্তো ঝরে পড়ে।

—সত্যি বলছিস্?

—বলি নি আবার! শুনে তো দিদি আমার ধিন্‌ধিন্ করে পাড়ায় পাড়ায় ভাবী জামাইয়ের গল্প করে নেচে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে জামাইবাবুকে নিয়ে। একেবারে রামচন্দ্রের ধনুকের মত বেঁকে বসে

জরুরী কাগজ! একেবারে আস্ত সিঁদেল চোর ঘরের মধ্যে পুষে রেখেছি গা। বের কর!

খুব সন্তর্পণে ছুটি আংগুলের ডগায় বাধিয়ে টেনে তুলল বনমালী সিনেমার টিকেটখানা—

—কি ওটা?

—আঁজ্ঞে, টকীর টিকিট!

—টকীর টিকিট তুই কোথায় পেলি?

—আঁজ্ঞে, খুব ভাল বই কিনা। 'মনের মানুষ'! যেমন নাচ, তেমনি গান। কত দিন যে টকী দেখি নি। সেই কবে রূপকুমারীর সেই 'ঝুন ঝুনওয়ালী' টকীটা দেখেছি। তারপর তো—

—তার মানে বাজারের পয়সাগুলো সব উড়িয়ে দিয়ে এসেছ। দাঁড়াও, বাবু বাড়ীতে ফিরলে, আজ এর একটা হেস্তনেস্ত করবই। তিনি থাকুন তাঁর আদুরে চাকর নিয়ে, আমি এ বাড়ীতে থাকতে পারব না!

—মা, ইষ্টিশনে সবাই বলছিল—

—দূর পোড়ারমুখো, তোর কোন কথা শুনব না। দে দেখি ফিরিয়ে বাজার ফেরৎ টাকা?

পকেট থেকে সামান্য কিছু খুচরো পয়সা বের করতে করতে বনমালী বলল, সবাই বলছিল যে, মামাবাবু নাকি একখানা উড়োজাহাজ কিনেছেন।

বনমালীর এই মিথ্যে উক্তিতে আশ্চর্যরকমের ফল দেখা গেল। সব রাগ জল হয়ে গিয়ে খুসী মেজাজে এক গাল হেসে মনোরমা বনমালীর কাছে এগিয়ে অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কণ্ঠস্বরে বললেন, হ্যাঁরে বনো, কি বলছে-রে? উড়োজাহাজ কিনেছে? কিনতেই তো পারে! দাদার পক্ষে উড়োজাহাজ কেনা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার! সবাই বলছে বুঝি?

বাজার-ফেরৎ পয়সাগুলো সকৌতুকে আবার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বনমালী বলল, বলছে কি, নন্দনপুরের সবাই দেখেছে!

এমনই বনমালীর ভাগ্য যে, ইতিমধ্যে তার কানে এল উড়োজাহাজের শব্দ। উঠোনে দাঁড়িয়েই সে আকাশের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। দূরে ছোট্ট একখানা উড়োজাহাজ দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে

উঠল, ঐ যে, ঐখানাই তো মামাবাবুর নতুন উড়োজাহাজ! আজ কদিন ধরে শুধু নন্দনপুরের ওপরেই পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমিও তো তাই বলি যে, মামাবাবুর ছাড়া আর কার উড়োজাহাজ নন্দনপুর ইষ্টিশনের মাথার ওপর চিলের মত উড়ে বেড়াবে?

মনোরমাও উঠোনে নেমে বনমালীর পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে গদগদভাবে তাঁর দাদার উড়োজাহাজ দেখতে লাগলেন। তাঁর মাথার ঘোমটা খুলে পড়ে গেল।

—সত্যিই বনো, কি সুন্দর দেখতে উড়োজাহাজখানাকে! তাই না?

—তাই তো সবাই বলাবলি করছে যে, এমন উড়োজাহাজ বড়বাবুর সম্বন্ধী ছাড়া আর কে কিনতে পারেন?

—দাদা বলছিলও বটে যে, সেই পুরণো ঝরঝরে মোটরখানা বেঁচে দেবে। বোধ হয় সেটা বেচে দিয়ে আর কিছু টাকা খাটিয়েই উড়োজাহাজটা কিনেছে। যাক্ এবার বাপের বাড়ী গিয়ে তব একটু উড়োজাহাজে চড়ে বেড়ানো যাবে।

আব্দেরে খোকাটির মত সুর করে বনমালী বলল, মা আমিও কিন্তু চড়বো!

বনমালী ও মনোরমাকে অমন করে উর্দ্ধমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে দেখতে লাগল।

—কি দেখছো, মা? উড়োজাহাজ?

—হ্যাঁরে, তোর মামাবাবুর উড়োজাহাজ!

—ধোৎ! মামাবাবু আবার উড়োজাহাজ কোথায় পাবেন?

—দেখো মেয়ের বুদ্ধি! তুই বল্-না, বনো। তোর দিদিমণিকে একবার বল্-না ইষ্টিশনে কি শুনে এলি?

—হ্যাঁ দিদিমণি, সবাই বলছে, বড়বাবুর সম্বন্ধী নাকি উড়োজাহাজ কিনেছেন। খুব বড়লোক কিনা, তাই উড়োজাহাজে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ান!

দাঁতে দাঁত চেপে সরমা বনমালীর দিকে কট্মট্ করে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, মিথ্যের ডিপো একটি! যত সব আজগুবি কথায় শ্রাদ্ধ করবে সর্বক্ষণ!

সরমা আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে নিজের কাজে মন দিল। উড়ো-জাহাজের শব্দ মিলিয়ে গেল। মনোরমা আবার নিজের জগতে যেন ফিরে এলেন। বললেন, যা বনমালী,, মাছ কুটে দে তাড়াতাড়ি! বেলা যে অনেক হল!

—যাই, মা!

খুসী মনে বনমালী কাজ করতে গেল। মনোরমাও বাজারের ফেরৎ পয়সা চাইতে ভুলে গেলেন।

আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে। এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে হয়ত। বাইরের ঘরে সরমা আর নিখিল বসে তাকিয়ে ছিল দূরের বিলটার দিকে।

আকাশের অবস্থা দেখে নিখিল বলল, বৃষ্টি আসছে, এবার উঠি!

—এখন বেরোলে বৃষ্টিতে তুমি ভিজে যাবে! একটু বসে যাও!

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওরা সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পেল। দূরে বিলের ওপার থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া বৃষ্টির অগ্র-সঞ্চারণ বেশ বোঝা যায়। ওরা সেদিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে ঝুপঝাপ বৃষ্টি এসে গেল ওদের বাড়ীতেও।

মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে। নিখিলের মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা—

'বারি ঝরে ঝরঝর ভরা ভাদরে···'

সরমা বলল, ভারি ভাল লাগে আমার এমনি বৃষ্টি। অঝোর বর্ষণে মেঘের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে গিয়ে আকাশ হয়ে উঠবে সুনীল নির্মল!

নিখিল বলল, এই উন্মাদ বর্ষণে মনটা সত্যিই যেন উদাস হয়ে ওঠে। তাই বর্ষা নিয়ে যুগে যুগে রচিত হয়েছে কত কাব্য, রূপ পেয়েছে তাতে যক্ষের বিরহ আর মেঘদূতের কাছে কত-না স্তুতি! এমনি বৃষ্টির দিনে তোমায় একটি কথা বলতে চাই, সরমা!

—বলো, আজ তোমার সব কথা শুনব! মনটা আজ ভারি খুসী লাগছে।

আর একটা দমকা হাওয়া এসে ঘরে ঢুকল। সরমা এলায়িত কেশে বিস্রস্ত বেশবাসে উদাস ভঙ্গীতে জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার

দৃষ্টিটা সে প্রসারিত করে দিল বহু দূর পর্যন্ত বর্ষণ-মুখর প্রান্তরের দিকে, এবং কখনও-বা এপাশের রেল-কলোনীর কোয়ার্টারগুলোর; সুপুরি আর নারকেল গাছের সারির দিকে।

নিখিল তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। সরমা পেছন ফিরে তার মুখের দিকে আবেশবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বল, কি যেন বলতে চাইছিলে?

নিখিলের চোখ-মুখ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। অস্ফুট স্বরে সে বলতে চেষ্টা করল, সরমা তুমি—

এমন সময় পাশের ঘর থেকে মনোরমা বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, সুমি, ও সুমি, উঠোনের কাপড়-চোপড় যে সব ভিজে একাকার হয়ে গেছে? বনমালী পোড়ারমুখোই বা কোথায় গিয়ে মরেছে? ও সুমি—

—যাই, মা!

সরমা আস্তে আস্তে নিখিলের হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল, আমি এক্ষুনি আসছি।

সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিখিল কি যেন একটুক্ষণ ভাবল, তারপর হঠাৎ সেই বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই সরমা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। এসে নিখিলকে ঘরে না দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল। জানলাটার কাছে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল যে, নিখিল হেঁটে চলেছে।

সরমার কাছে এমনি করে নিখিলের হঠাৎ চলে যাওয়াটা ভাল লাগল না। মনটা তার অচিরেই খারাপ হয়ে গেল। সে-ও একটু ইতস্তত: করল, তারপর সেই বৃষ্টির মধ্যে অতি আকস্মিকভাবেই বেরিয়ে পড়ল। ভিজতে ভিজতে সে-ও ছুটতে লাগল নিখিলের কোয়ার্টারের দিকে।

নিখিল নিজের ঘরে ঢুকে ভিজে জামা-কাপড়েই হাতে তুলে নিল তার প্রিয় বাঁশীটা। তারপর খাটের ওপর বসে উদাস মনে বাজাতে লাগল মেঘমল্লারের সুর। সরমা তার পেছনে দরজার চৌকাঠের ওপর মিনিট

কয়েক দাঁড়াল, তারপর কি এক অদম্য প্রেরণায় সে ধীরে ধীরে নিখিলের পিঠের ওপর আলতোভাবে ঠেস্ দিয়ে বসল। নিখিল দ্বিতীয় কোন সত্বার অস্তিত্বের সাড়ায় চমকে উঠল। বাজনা আপনা থেকেই থেমে গেল। নিখিল আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল। সরমার দৃষ্টি সুগভীর। নিখিলের চোখে চোখ রেখে হাওয়ার মতো হালকা স্বরে সে বলল, তুমি অমন করে চলে এলে কেন?

নিখিল নিরুত্তর। সরমার কাছ থেকে নিজেকে সন্তর্পণে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে সে বলল, একি পাগলামি করেছ? এ যে একেবারেই ভিজে গেছ!

—বাজাও তেমনি করে, যেমনটি বাজাচ্ছিলে! বাজাও—

বাইরে তখনও সমান গতিতে বর্ষণ চলছে। নিখিল আবার তেমনি করে বাজাতে লাগল। আর আনন্দের আতিশয্যে নিখিলের পেছনে বসে সরমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এমন সুখ কি কেউ কখনও অনুভব করেছে? আনন্দই জীবন। আনন্দের জন্যেই মানুষ বাঁচতে চায়। এমন করে জীবনকে ভোগ না করতে পারলে বেঁচে থেকে কি লাভ? সরমার অশ্রুধারা কি বাইরের বর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়?

কিন্তু খুব হঠাৎ ছন্নছাড়া বৃষ্টিটা থেমে গেল। আর সরমাও যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে এল। নিখিলের বাঁশীও থেমে গেছে। সরমার হয়তো এতক্ষণে চেতনা হল যে, এমনি করে পাগলের মতো বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ী ছেড়ে নিখিলের ঘরে তার এত কাছে চলে আসাটা তার আদৌ উচিত হয় নি। সে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। তারপর কোন কথা না বলে মৃদু হেসে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিখিল কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মতো দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ চার ॥

মোহনের বোন স্বর্ণময়ীকে নিখিল খুবই স্নেহ করে। নিখিলের কোন বোন যে নেই, সে-অভাব সে বোধ করে না। স্বর্ণই তার সে-অভাব পূরণ করেছে। স্বর্ণ বোধ হয় তার নিজের দাদা মোহনের চেয়েও নিখিলকে বেশী ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। স্বর্ণের লেখাপড়া ও সাধারণ শিক্ষার সব ভার নিখিল আনন্দিত চিত্তে নিজের হাতে নিয়ে যেন বেঁচেছে।

মোহনের ভাগ্যও প্রায় নিখিলের মতোই। সে-ও মাতৃ-পিতৃহীন। ঐ একটিমাত্র বোন। তা-ও এক রকম নাবালিকা। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স স্বর্ণের। তবু এই বয়সেই সে তাদের দুজনের সংসারের সবকিছু ঝঞ্ঝাট মাথায় তুলে নিয়েছে।

বিকেলের ডিউটির পর প্রায়ই নিখিল মোহনের কোয়ার্টারে আসে। কখনও মোহন থাকে তার কোয়ার্টারে, আবার কখনও সে ডিউটিতে থাকে। যখন তারা তিন জন এক সঙ্গে থাকে, তখন তাদের দেখে অচেনা যে-কোন মানুষই বলবে যে, তারা আপন ভাই-বোন। স্বর্ণকে নিয়ে দুবন্ধুর দিনগুলো বেশ কাটে।

স্বর্ণও খুব অভিমানী চপলমতি প্রাণবন্তী মেয়ে। অনেক সময় অনেক ছোটখাটো ব্যাপারে নিখিলের প্রতি অভিমান করে। আর দু বন্ধু মিলে তাই নিয়ে কত মজাই-না করে!

আজ বিকেলে নিখিলের আসতে এত দেরী যে হবে, তা কি স্বর্ণ জানত? তাহলে কি আর নিখিলের জন্যে কেটলিতে এত আগেই চায়ের জল ঢেলে বসে থাকত? সত্যিই বড় বিশ্রী লাগছে স্বর্ণের। আর কতক্ষণ সে এমনি অপেক্ষা করে বসে থাকবে? উঠে জানলা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখে এল। কৈ? কোথাও নিখিলদার পাত্তা নেই! তবু সে কাপে চা ঢেলে ডিস্ দিয়ে কাপটা ঢেকে টেবিলের ওপর রেখে বইপত্র নিয়ে পড়তে বসল।

কিছু পরে হন্তদন্ত হয়ে নিখিল এসে ঘরে ঢুকল। ততক্ষণে কাপের চা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। স্বর্ণ গম্ভীরভাবে উঠে গিয়ে কাপের চা-টুকু

জানলা দিয়ে বাইরে ঢেলে ফেলে দিয়ে ফিরে এসে পড়ার টেবিলে বসল।

তার মুখ দেখে নিখিল বুঝতে পারল যে, কোথাও একটু গোলমাল হয়েছে। তাই পরিস্থিতিটাকে হালকা করবার জন্যে সে বলল, বুঝলি স্বর্ণ, এই দয়ারামকে নিয়ে আর পারলাম না!

স্বর্ণ তবুও নিরুত্তর। কিন্তু নিখিলের থামা চলবে না। সে অনর্গল-ভাবে বলে যেতে লাগল, বেরোচ্ছি, দয়ারাম বললে, ছোটবাবু চা খেয়ে যান, হয়ে গেছে চা! আমি বললাম, চা তো স্বর্ণের কাছে খাব, তুই আবার চা তৈরী করতে গেলি কেন? দয়ারাম বেচারা বললে, স্বর্ণদির চা তো রোজই খান, আজ আমার হাতের চা খেয়ে দেখুন, কেমন লাগে? ইষ্টিশনের ভেণ্ডারদের কাছ থেকে নতুন চা তৈরী করা শিখলাম কিনা! তা, অত করে যখন বলল, তখন আর 'না' বলতে পারলাম না। চা-য়ে এক চুমুক দিতেই প্রায় বমি হয় আর কি! সব চা-টাই একটান মেরে ফেলে দিলাম। দয়ারাম বেকুবের মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

স্বর্ণ এবার আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারল না। দয়ারামের নিন্দে শুনে এবং নিখিলের বিকেলে চা পান হয় নি জেনে আনন্দিত হয়ে বলল, সত্যি? হুঁ, দয়ারাম আবার চা তৈরী করবে? না-হয়, ডাল-তরকারিই আমার চেয়ে ভাল রাঁধতে পারে, কিন্তু তাই বলে চা তৈরী করা আমি ওকে শেখাতে পারি। হ্যাঁ! তাহলে তোমার চা খাওয়া হয় নি?

—বারে, তা কেমন করে হবে? তুমিও তো চা-টা আমার সামনে ফেলে দিলে!

—ঠাণ্ডা চা তুমি কোন কালে খেতে পার?

—তা অবশ্য পারি নে!

—তুমি পাঁচ মিনিট বস নিখিলদা, আমি এক্ষুনি চা তৈরী করে আনছি।

স্বর্ণ খুসী মনে উঠে গেল। নিখিল স্বর্ণের সারল্যময় ছেলেমানুষি দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বর্ণ চা তৈরী করে নিয়ে এল। খুসী মনে নিখিল

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, বাঃ! এই না হলে আবার চা? দয়ারামের চায়ের চেয়ে টিউবয়েলের জলও ভাল!

স্বর্ণের মুখের তৃপ্তির হাসিটা লক্ষ্য করে নিখিল মনে মনে খুবই আনন্দিত হল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। স্বর্ণ একটি হারিকেন জ্বালিয়ে আনতেই নিখিল গেয়ে উঠল, 'আলো চাই আশা চাই!'

স্বর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, নতুন গান বুঝি?

—হ্যাঁ!

—তাহলে আজ আর পড়া নয়। আজ এই গানটাই আমায় শিখিয়ে দাও!

—বেশ তো! গাইছি, তুই তুলে নে—

নিখিল এক একটি পংক্তি গাইল, আর স্বর্ণ তা অবিকলভাবে নিজের গলায় তুলে নিতে লাগল। গানের বাণীগুলো স্বর্ণের বেশ ভাল লাগল। এত গান সে নিখিলের কাছ থেকে শিখেছে, কিন্তু এমন সুন্দর গান সে একটাও শেখে নি। আলো আর আনন্দময় জীবনের তপস্যার এমন মন্ত্র সে ইতিপূর্বে তার ছোট্ট জীবনের পরিধিতে কোথাও প্রত্যক্ষ করে নি। নিখিলের কাছে সে গানটা শিখে মনে মনে খুবই কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল। বলল, নিখিলদা, এ গান আমি কোনদিন ভুলব না। এবার থেকে রোজ এ গানটাই শুধু গাইব।

স্বর্ণের সারল্যমাখা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে নিখিলও মুগ্ধ হয়ে পড়ল। বলল, বোন, জীবনে কখনও যদি দেখিস্ যে, দুঃখের বিপদের বা বাধার অন্ধকারের পুঞ্জীভূত কালো মেঘ ধীরে ধীরে তোকে গ্রাস করতে আসছে, তখন এই গান তুই গাস্, দেখবি, জীবনের সব কালো ছায়া কোথায় পালিয়ে গেছে। আলোর প্রার্থনা শুনে আঁধারের দূতেরা কি কখনও এগোতে সাহস পায়?

সবগুলো ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে সবটুকু মন ঢেলে দিয়ে স্বর্ণ শুনছিল নিখিলের কথা। সত্যিই, নিখিলদার মূল্যবান কথাগুলো শুনতে তার তার খুব ভাল লাগে। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে কে থাকতে পারে?

নিখিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার চলি বোন, তুই বসে পড়। কেমন।

—দেখ, নিখিলদার কাণ্ড দেখ।

—কেন, কি হল আবার ?

—জামাটা কাঁধের কাছে কতটা ছিঁড়ে গেছে। সে-খেয়ালও নেই। এই ছেঁড়া জামা গায়ে ইল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়াচ্ছো ? ইস্! দাঁড়াও, আমি এক মিনিটে সেলাই করে দিচ্ছি।

—ছেড়ে দে, আর সেলাই করতে হবে না। জামা থাকলেই ছেঁড়ে, না থাকলে তো আর ছিঁড়তে পারত না। আমার একটা জামা আছে, এইটেই তো বড় কথা।

—এ ব্যাপারে, নিখিলদা, তোমার কোন আদর্শের কথাই শুনব না।

স্বর্ণ চক্ষের নিমেষে ছুঁচ, সুতো নিয়ে এসে সেলাই করতে লাগল নিখিলের জামাটা। আর নিতান্ত শিশুর মতো নিরবে নিখিল স্বর্ণের সেই ভালবাসার শাসন মেনে নিতে লাগল। এমন সময় মোহন এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই সে ব্যাপারটা দেখে হো হো করে হেসে উঠল।

—হাসছিস্ যে বড় ?

—ছেঁড়া জামা পরাটা তোর অভাব না স্বভাবে দাঁড়িয়েছে, তাই ভাবছি।

—দেখ না দাদা, এই জামা পরে কেমন করে যে নিখিলদা সারা নন্দনপুর টহল দিয়ে বেড়ায়, কে জানে !

হাতের ওপর ভাঁজ করে রাখা রেলের ইউনিফর্মের কোটটা দেখিয়ে নিখিল বলল, কেন, এই কোটটা গায়ে পরলে জামাটার ছেঁড়া জায়গাটা চাপা পড়ে যায়। তখন কেউ বুঝতেই পারবে না যে জামাটা পুরনো।

—কি দরকার তোর এই দৈন্যকে পুষে রেখে ? একলা মানুষ, বিয়ে-থা করিস্ নি। যা রোজগার করিস্, তাতে রাজার হালে থাকতে পারিস্। সত্যি বল্ তো, তুই কি করিস্ টাকাগুলো ?

নিখিল মোহনের এই প্রশ্নে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। ঘরের ভেতরের হাল্কা আবহাওয়াটা আবার থমথমে হয়ে উঠল। নিখিল একটু দম নিয়ে বলল, সব টাকা জমাই।

—জমাস্ ? কিন্তু এমন করে টাকা জমানোর কি এত দরকার ?

এবার নিখিলের কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল।

—তোমার আর কি? যা টাকা পাচ্ছ, তাই উড়িয়ে দিচ্ছ! খেয়াল করেছ কখনও যে, বোনটা বড় হচ্ছে?

—বোন বড় হচ্ছে, তাতে কি হয়েছে?

—এই নইলে আর দাদা! ওর বিয়ে দিতে হবে না?

—ও:, সেইজন্যে তুই এখন থেকে টাকা জমাচ্ছিস্? পাগল!

আবার হেসে উঠল মোহন। কিন্তু মোহনের হাসিতে খুব বিরক্ত হয়েই নিখিল বলল, বোনটাকে যা-তা ঘরে যেমন-তেমন করে আমি বিয়ে দিতে পারব না, মোহন। সবাই ওর মত মেয়েকে বুঝবেও না, ওর দামও দিতে জানবে না। ভাল পাত্র বিনা পয়সায় পাওয়াও যায় না।

নিখিল থামল। স্বর্ণ হাতের সেলাই শেষ করে স্বাভাবিক লজ্জায় পাশের ঘরে চলে গেল।

নিখিল আবার বলল, আমরা দুজনে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই স্বর্ণের বেশ ভাল একটা বিয়ে দিতে পারব। কি বলিস্?

এবার মোহন নিখিলের গভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, স্বর্ণের জন্যে তুই এতখানি ভাবিস্!

—ভাবি নে? আমার একটা বোন থাকলেও তো এমনি করে আমায় ভাবতে হত।

একটুক্ষণ থেমে নিখিল আবার বলতে লাগল, স্বর্ণ আমাদের কাছে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গিয়েও কি আবার দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করবে নাকি? তা হবে না। উপযুক্ত পাত্রের হাতে আমি ওর জীবনের দায়িত্ব তুলে দিতে চাই।

মোহন কোনদিন স্বর্ণকে নিয়ে এত কথা এমন করে ভাবতে পারে নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস্? গত জন্মে তুই হয়তো আমাদের আপন ভাই ছিলি!

—আমারও তাই মনে হয়!

আর কোন কথা না বলে নিখিল ধীর পদক্ষেপে মোহনের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে গেল। রাত তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ষ্টেশনটা আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। একখানা মালগাড়ীর একটানা ঝকড়্-ঝক্ শব্দ শুনতে শুনতে নিখিল পথ চলতে লাগল। একখানা সান্টিং

ইঞ্জিনের তীব্র হেড লাইট এসে তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। সে ভাবছিল স্বর্ণের কথা। স্বর্ণকে গড়ে তোলা, তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দেওয়া, তারপর মোহনেরও একটা বিয়ে দেওয়া—কত কত কাজ এখনও তার করতে বাকি! তারপরই মনে পড়ল দয়ারামের কথাগুলো. 'ছোটবাবু, এবার একটা বিয়ে করুন!' নিজের বিয়ের কথা মনে হতেই আপন মনে সে বলল, ধ্যেৎ! আমার আবার বিয়ে!

এসে পড়েছে সে রাস্তায়। আলোয় আলোময় চারদিক। দোকান পসার, লোকজন, হৈ চৈ,—সরগরম শহর নন্দনপুর। গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে সে লাইব্রেরীর দিকে গেল। একটা ভাল বই সে লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসবে। কদিন ধরে সে কোন বই পড়ছে না। বই পড়াটা তার একটা অভ্যাস। বই তার নিরালা জীবনের সঙ্গী।

লাইব্রেরীতে গিয়ে নিখিল দেখে যে, তার সহকর্মী কয়েকটি বন্ধু একটি সভা বসিয়েছে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, একটি 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান করা। খুব উৎসাহের সঙ্গে জয়ন্ত, সুজিৎ, শিবনাথ প্রভৃতি সদস্যেরা পরিকল্পনায় মেতে ছিল এতক্ষণ যাবৎ। নিখিলকে দেখতে পেয়ে তারা আরও উদ্দীপনার সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

জয়ন্ত বলল, নিখিল, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। 'বর্ষামঙ্গলে'র ভার এই নন্দনপুরে তুমি ছাড়া আর কেউ যে নিতে পারে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি। তোমাকেই ভাই, সব ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু!

সুজিৎ বলল, নিখিলদা, তুমি শুধু আমাদের হুকুম করে যাবে. আর আমরা চোখটি বুজে তা তামিল করব। তোমার ব্যবস্থায় যদি কেউ কথা কইতে আসে তো ছেড়ে দেব না তাকে, একটু জেনে রেখো।

সুজিৎ ছেলেটি বয়সে সকলের চেয়ে ছোট। মাত্র মাস কয়েক আগে বুকিং ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হয়েছে। বয়সে তরুণ বলেই বোধ করি সব ব্যাপারে উৎসাহ ও উত্তেজনা তার সব চেয়ে বেশী। নিখিল খুবই ভালবাসে তাকে। তাই হেসে বলল, বেশ তো. 'বর্ষামঙ্গল' করতে তো আমার অনিচ্ছে কিছু নেই। সবাই যদি তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে যোগদান কর তো বেশ ভালভাবেই অনুষ্ঠান করা চলে।

শিবনাথ বলল, আমাদের রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের ষ্টেজে হতে পারবে তো? তোমার কি মনে হয়?

—নিশ্চয়ই হতে পারে! তবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে কারা? তোমাদের মধ্যে কে কে গান গাইতে পার? কে কে বা নাচতে পার? তাছাড়া এই সঙ্গে ছোটদের জন্তে একটা ছোট নাটিকার ব্যবস্থাও রাখতে চাই। তাতে তোমাদের মত আছে তো?

এই কথায় উপস্থিত প্রায় দশ-বার জন সদস্য সমস্বরে বলে উঠল, খুব ভাল প্রস্তাব। চমৎকার!

সেই সভায় নিখিলকে সবাই সভাপতি মনোনীত করে ফেলল 'বর্ষা-মঙ্গল' অনুষ্ঠানের জন্তে।

নিখিল তখন শিল্পী নির্বাচনে মনোনিবেশ করল। রেলকর্মীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম লেখা হল। তারপর রেলকর্মীদের মেয়ে বা বোনদের মধ্যে যাদের নাচ-গানের প্রতি ঝোঁক আছে, তাদের নামের তালিকাও প্রস্তুত হল।

দেখতে দেখতে দিন তিনেকের মধ্যে রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের হলঘরেই অনুষ্ঠানের মহলা চলতে লাগল। রোজ সন্ধ্যায় কিংবা সুবিধেমত দুপুর বেলায় মহলা চলতে লাগল।

স্বর্ণময়ীর নাম গান এবং নাচের জন্তে, এবং সরমার নাম শুধু গানের জন্তে নিখিল তালিকাবদ্ধ করে নিল। মহলায় তারাও নিয়মিতভাবে আসতে সুরু করল। গানে প্রধান অংশ গ্রহণ করল সরমা। নিখিল ও সরমা—উভয়ের যুগ্ম কণ্ঠ গানের দিকটাকে বেশ জোরালো করে তুলল। অন্যান্তেরা কণ্ঠদানে তাদের সহযোগিতা করলমাত্র।

আর নাচে স্বর্ণের জোড়া মেলা ভার। প্রতিটি উল্লেখযোগ্য নাচের পুরোভাগে সে অতি দক্ষতার সঙ্গেই মহলা দিতে লাগল।

নিখিলের পাশাপাশি বসে গান গাইতে সরমার বেশ ভালই লাগে। কিন্তু মহলার মাধ্যমে স্বর্ণের প্রতি নিখিলের অতি মনোযোগটুকুকে কিছুতে সে সহজভাবে নিতে পারে না। স্বর্ণের প্রতি তার মনে অতি সাধারণ নারীদের মতোই অতি সুক্ষ্ম সন্দেহের পর্দা আপন মহিমায় অতি সহজেই ইতিমধ্যে কখন যে স্থান করে নিয়েছিল, তা বোধ করি সে

নিজেও জানতে পারে নি। তাই সেদিন নিয়মিত মহলার পরে সরমা নিখিলকে একান্তে ডেকে নিয়ে গল্প করতে করতে গেল রেলকলোনীর সুদৃশ্য ঝিলটির দিকে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছে। নন্দনপুরের আকাশে টুকরো মেঘের আনাগোনা। তারই মাঝে এক ফালি চাঁদ উঠেছে আবছা জোছ্‌নার ছায়া চারদিকে ছড়িয়ে। কিছুক্ষণ আগে এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে পথের দুপাশের ঘাসেরা ভিজে উঠেছে। দু-একটা জোনাকি তারই ভেতর কি যেন খোঁজাখুঁজি করে মরছে। নিখিল আর সরমা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ আকাশের এক কোণে নারকেল গাছের মাথার ওপাশে ঢাকা-পড়া চাঁদখানার দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, বর্ষার আকাশে চাঁদের বাহার দেখেছ?

—দেখেছি। স্বর্ণ তোমার কে?

—কেন? স্বর্ণ যে আমার বোনের চেয়েও বেশী, তা তো তোমার অজানা নয়, সরমা? হঠাৎ এমনতর প্রশ্ন করছ কেন?

—আমারও তাই মনে হয়। স্বর্ণ তোমার বোনের চেয়েও বেশী—অনেকখানি বেশী।

চাঁদের আবছা আলোয় সরমার চোখে-মুখে যে বিদ্রূপের হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল, নিখিলের মতো সহজ মানুষের পক্ষে তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না, আর তা সম্ভব হলেও হৃদয়ঙ্গম করা হয়ত দুরূহ হত।

নিখিলকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সরমা আবার কথা বলল।

—আমার একটা কথা রাখবে?

—বল।

—তুমি স্বর্ণদের বাড়ীতে যাবে না, বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। কথা দাও!

খুব স্পষ্ট স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে থমকে দাঁড়িয়ে সরমা কঠিন দৃষ্টিতে নিখিলের চোখে চোখ রেখে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

আর নিখিলও তার মুখের ভেতর আবিষ্কার করল যেন অন্য এক

নারীকে, যে অহরহ তার চোখে দেখা সরমা থেকে অনেকখানি স্থূল, অনেকখানি অকরুণ,আবার অনেকখানি অকপটও। তবু নিখিল কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না সেই স্বার্থপর, হীনমনা নারীর অযৌক্তিক আবদারের উগ্রতাকে। তার প্রসঙ্গটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে সে-ও কঠিন স্বরে বলল, চল ফিরে যাই। রাত্তির হয়ে গেছে।

অভিমানে আহত সরমা নিখিলের এই অপ্রত্যাশিত অবজ্ঞার দহনে রক্তিম হয়ে উঠে আর একটি কথাও না বলে, আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা না করে বাড়ীর পথে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলল।

নিজের ঘরে ফিরে নিখিল বারবার ভাবল সরমার কথা। সরমার সংকীর্ণ মনের কথা ভেবে মনে মনে সে কষ্ট পেল। তারপর নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে সে ভাবল যে, এটা নিতান্তই সরমার ছেলেমানুষি! এটাকে এতকিছু গুরুত্ব দেওয়া তার ঠিক হয় নি। সত্যিই মিছামিছি সে তার মন খারাপ করছে। 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানের আর মাত্র দিন দশেক বাকি। এরই মধ্যে সবকিছু আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। দেখতে দেখতে আবার সে নিজের বিচিত্র মনের সাগরে ডুবিয়ে তলিয়ে গিয়ে স্বস্তি পেল।

কিন্তু সরমা বাড়ীতে ফিরে স্বস্তি পায় নি। স্বর্ণের অস্তিত্বের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত তার কাছে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছিল। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, স্বর্ণ কোনদিন তার সঙ্গে কোন রকমের অশোভন বা অপ্রীতিকর ব্যবহার করে নি, বরং তাকে যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শনই করে এসেছে চিরদিন। তবু—তবু স্বর্ণকে সে সহ্য করতে পারে না, তাকে সে আদৌ পছন্দ করে না। হয়ত স্বর্ণের প্রতি তার মনে এতখানি বিতৃষ্ণা স্থান পেত না, যদি-না নিখিলের সংস্পর্শ থাকত এই ব্যাপারের সঙ্গে। নিখিলকে বাদ দিয়ে স্বর্ণকে উপেক্ষা করে চলে। কিন্তু নিখিল যেখানে সরমার জীবনে মুখ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে, সেখানে স্বর্ণের স্থান গৌণেরও অধিক মূল্যহীন।

ঝিলের পাশ দিয়ে তারা দুজন যখন পাশাপাশি হেঁটে চলছিল সেই আলো-আঁধারি সরু পথটি ধরে নির্জনতর পরিবেশের দিকে, তখন

ষ্টেশনের দু-একজন স্টাফের নজরে তা পড়ে। তারা চেনে সরমাকে বড়বাবুর মেয়ে বলে, আর জানে নিখিলকে বড়বাবুর বিশেষ স্নেহের পাত্র বলে। তারা দুজন যখন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে বোঝাপড়া করছিল, সেই বিশেষ মুহূর্তটি সেই দর্শকদের মনে একটি বিশেষ ধরনের ছাপ এঁকে দিয়েছিল। তাই তারা ষ্টেশনের বন্ধুদের মধ্যে ব্যাপারটিকে একটু রসগ্রাহী করে বর্ণনা করতে উৎসাহবোধ করল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা নন্দনপুর ষ্টেশনে এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, প্রায়ই রাত্রির অন্ধকারে ঝিলের ধারে যে এক জোড়া কপোত-কপোতী অভিসারে বের হয়, তারা নিখিল ও সরমা ছাড়া আর কেউ নয়। নিখিলের স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা যারা এড়িয়ে চলত, বা বড়বাবু রাখালবাবুর কাছ থেকে যারা চাকরির ব্যাপারে আশানুরূপ সুযোগ সুবিধে আদায় করে নিতে পরাঙ্মুখ হত, তারাই বিশেষ করে একটি সন্ধ্যার ব্যাপারকে বহু রাত্তিরের পুনরাবৃত্ত কাহিনী বলে প্রচার করে আনন্দানুভব করতে লাগল।

প্রথম কথাটা নিয়ে আলোচনা সুরু হয় বুকিং ক্লার্ক তারাপদবাবু, এ-এস-এম সুপ্রকাশবাবু আর পয়েন্টম্যান রঘুনাথের মধ্যে। তারাপদবাবু মানুষটির প্রকৃতি একটু জটিল। পৃথিবীর কোনকিছুর মধ্যে একটি অতি বিকৃত বক্ররেখার প্রতিফলন কল্পনার রঙিন চশমায় প্রত্যক্ষ করে নিজে যেমন তৃপ্তি পান, অপরকেও তেমনি তৃপ্তি দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর এই অসাধারণ প্রকৃতির বিষয়ে অনেকেই সতর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাঠিন্যময় ব্যক্তিত্বের সাময়িক সরসতার প্রতি আবার অনেকেই আপনা থেকে আকৃষ্ট হয়ে পড়তে বাধ্য হয়ে থাকে।

ঝিলের ধারে নিখিলের পাশে সরমাকে তারাপদবাবু নিজের চোখে দেখেন নি। তিনি ব্যাপারটা শুনেছেন তাঁর প্রিয়পাত্র রঘুনাথের কাছে। রঘুনাথ নিজের চোখে তাদের দেখেছে, অথবা কারো মুখে ব্যাপারটা শুনেছে, তা নিয়ে আদৌ মাথা না ঘামিয়ে তারাপদবাবু নিজের চোখে বিকৃতি এমন অঘটন ঘটতে দেখেছেন বলে গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে সবিস্তারে দিলেন। শুনে সুপ্রকাশবাবুর চক্ষু স্থির। এমন সাংঘাতিক ঘটনা কলিকালে ঘটতেও পারে!

সুপ্রকাশবাবু অত্যন্ত স্ত্রৈণ প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোন নতুন কথা

শুনলে, কিংবা তাঁর জীবনে সামান্যতম নতুন কোন ঘটনা ঘটলে, অর্থাৎ তাঁর ধরা-বাঁধা জীবনের মধ্যে তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলে তিনি তক্ষুনি তাঁর স্ত্রীর কানে তা না পৌঁছে দিতে পারা পর্যন্ত স্বস্তি পান না। তারাপদ বাবুর কাছে মুখরোচক খবরটি শুনে তিনি একটি মুহূর্তও অপব্যয় না করে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ছুটলেন।

কোয়ার্টারে পৌঁছেই স্ত্রীর কাছে বেশ একটু রসিয়ে কথাটা বললেন। তাঁর নিঃসন্তানা গৃহিণী সারা দিন মগ্ন থাকবার মতো কোন কাজ পান না বলে সময় যেন তাঁর আর কাটতে চায় না। তাই আপাততঃ এমন চমৎকার একটি খবর শুনেই তিনি পাড়ার মেয়েদের কাছে বেরিয়ে পড়লেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খবরটা সারা নন্দনপুরে ছড়িয়ে পড়ল। অ নকেই মনে মনে নিখিল এবং সরমার বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়ার আশা মনে মনে পোষণ করতে লাগল।

কথাটা মনোরমার কানে গেল। রাখালবাবুর শুনতেও বাকি রইল না! কিন্তু তাঁরা কথাটা আদৌ বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস করবার মতো কোন কারণই তাঁরা দেখতে পেলেন না। কারণ ভাল ছেলে বলে নিখিলের যথেষ্ট সুনাম ছিল নন্দনপুরে। আর সরমা তো তাঁদের নিজেদের মেয়ে। তার সম্বন্ধে কুৎসিত কোন-কিছু ভাবতে পারা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা ডালে-পাতায় বিস্তারিত ও রঙে-রসে সঞ্জীবিত হয়ে অচিরেই নিখিলের কানে এসে পৌঁছল। কিন্তু নিখিল তার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ না করে নিয়মিত মহলা চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করল।

পরদিন সরমা মহলায় এল না। নিখিল খুবই আশ্চর্যবোধ করল। মহলার পর সে একবার ভাবল যে সরমাদের কোয়ার্টারে গিয়ে তার না আসার কারণটা জেনে আসবে। কিন্তু আবার ভাবল, থাক, আর দু-একদিন দেখা যাক। স্বর্ণের ব্যাপার নিয়ে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে যদি সে মহলা উপেক্ষা করে থাকে তো করুক, সেজন্যে সে তাকে কখনই অনুরোধ জানাতে যাবে না অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে।

মহলা পুরো গতিতে চলতে লাগল। সরমা আর কখনই এল না।

নিখিল অন্য একটি কণ্ঠ দিয়ে কাজ চালিয়ে নিল। অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন হল। স্বর্ণের নাচ সকলকে মুগ্ধ করল। কিন্তু সরমার ব্যবহারে নিখিল এবার সত্যিই মর্মাহত হল। অন্তত: সরমাকে এতখানি লঘু প্রকৃতির মেয়ে সে কখনই ভাবে নি। সরমাকে মনে মনে ঘৃণা করতে গিয়ে নিজের মনে কষ্ট পেল সে হাজার গুণ বেশী। সরমার মূঢ়তার জন্যে তাকে ক্ষমা করতে তার খুব বেশী অসুবিধে হল না, কিন্তু নিজের অবুঝ মনের অসংগতির কাছে সে বারবার হার মানল, আর বারবারই সে দুঃখ পেয়ে পেয়ে হয়রাণ হল। তবু সরমাকে সে তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। আর স্বার্ণর সিংহাসনকে তুলে ধরল আরও ওপরে, যতদূর পর্যন্ত মন দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায়, ততদূর পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানটি দেখতে যাওয়ার মতো স্বাভাবিক স্পৃহাও সরমা অনুভব করে নি। সকলের মুখে অনুষ্ঠানটির সাফল্যের কথা শুনে এবং সেই সঙ্গে বিশেষভাবে নিখিল ও স্বর্ণময়ীর কৃতিত্বের উল্লেখ শুনে সে রীতিমত বিরক্ত ও মর্মাহত হয়ে পড়ল। অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে সে কয়েকটা দিন কাটাল। তার দুঃখ যে, নিখিল তার সামান্য একটা কথা রাখতে পারল না? স্বর্ণদের বাড়ীতে না গেলে নিখিলের কি এমন ক্ষতি-বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, তা কিছুতেই তার মাথায় এল না। সর্বোপরি, নিখিল তার প্রস্তাবের উত্তরে 'হ্যা' বা 'না'—কোন কথা না বলে বরং অপমানই করেছে তাকে।

সেই অপমানের আক্রোশে ফুলে ফুসলে উঠে সরমার আর যেন দিন কাটতে চায় না। কটা দিন বেশ উত্তাপ সে তার মনের মধ্যে জীয়ন্ত রেখেছিল। কিন্তু সে-উত্তাপ নিতান্তই রুগ্ন, পীড়াদায়ক—এবং শেষ পর্যন্ত তার নিজের কাছেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। আজ কত দিন সে নিখিলকে দেখে নি। তাকে একটিবার দেখবার জন্যেও অন্তত: তার মনটা একটু বিচলিত না হয়ে পারল না। আজ কত দিন সে ঘর থেকে বের হয় নি। আজ বিকেলে একবার সে কলোনীর পথে বেরোবে বলে মন করে সহসা নতুন উৎসাহে প্রসাধন পরিচর্যায় মনোনিবেশ করল।

॥ পাঁচ ॥

বনমালী যাচ্ছিল ষ্টেশনের প্লাটফর্ম দিয়ে হনহন করে হেঁটে। বড়বাবুর চাকর বলে ষ্টেশনের সর্বত্রই তার অবাধ গতি। প্লাটফর্মেই শশীনাথ দাঁড়িয়ে ছিলেন ওয়েটিং রুমের সামনে। বনমালীকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকলেন। বনমালী নিকটে গেলে ওয়েটিং রুমের ভেতরে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকে নিয়ে ঢুকলেন। বনমালী ঢুকে দেখে যে, এক কোণে স্তূপীকৃত করা রয়েছে অনেকগুলো তরকারি, মাছ, দুধ, ইত্যাদি।

শশীনাথ গর্বভরে বনমালীকে বললেন, জানিস্ বনো, এগুলো সব আজকের রোজগার। বলিস্ তোর দিদি-ভগ্নীপতিকে।

—মানে, আপনার ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীকে তো? তা বলব! এ তো সব চুরির মাল?

—চুরি? কেন, আমি কি চোর নাকি? বলি, আমি কি কারো পকেট কাটি, না কারো ঘরে সিঁদ্ কাটি, শুনি? বিনে টিকিটে বাবুরা রেলে চড়বেন, তা পয়সা চাইলেই চোর বনে গেলাম আর কি!

—চুরি ঠিক নয়,—উপরি পাওনা! তা ঐ একই কথা!

—কি বললি? একই কথা?

—না, মানে প্যাসেঞ্জারেরা আদর করে আপনাকে দিয়ে গেছে। এই আর কি!

—ঠিক বলেছিস্! ওদের একটা আক্কেল বলে কিছু আছে তো? তাই তো বলে যে, টিকিটবাবু, আপনি এগুলো না নিলে আমরা মনে দুঃখু পাব। তাই তো বাধ্য হয়ে আমাকে নিতে হয়। বুঝলি না, বনো। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে! তুই তো সবই বুঝিস্! হেঁ হেঁ!

—তা ঠিক! তাদের মনে তো আপনি আর দুঃখু দিতে পারেন না? সিগারেট আছে? সিগারেট?

—আছে। এই নে একটা। কিন্তু বনো, তোকে একটা কাজ করতে হবে। তুই নেহাৎ আমার আপনার লোক বলেই এ কথা বলছি। হাজার হলেও আর ছু দিন পরেই যখন আমার মামাশ্বশুর হতে যাচ্ছিস্, তখন তোর সঙ্গে তো আবার 'আপনি আঁজ্ঞে, করে কথা কইতে হবে।

—আসল কথাটা কি, শুনি ?

—এই জিনিষগুলো আমার ঘরে নিয়ে রেখে দিবি তোর যাওয়ার পথে। এই নে, এই বুঝি আবার সাঁত্রটি থ্রি ডাউন এল। একটু দাঁড়া বাবা, এই ট্রেনটা সেরে আসি !

বনমালী প্লাটফর্মের ওভারব্রিজটার তলায় বসে মনের আনন্দে সিগারেট টানতে লাগল। ট্রেনটা এসে ষ্টেশনে ঢুকল। প্যাসেঞ্জারের দল গেটে টিকিট জমা দিয়ে বের হয়ে যেতে লাগল। একজন বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জারকে শশীনাথ ধরে কিছু পয়সা আদায় করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু নিখিলকে সেখান দিয়ে যেতে দেখে তিনি একটু হকচকিয়ে গেলেন। কারণ নিখিল কারো কোন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। নিজে আদর্শবাদী মানুষ। তাই সে চায় যে, জগতটাও আদর্শবাদী হবে। দূর থেকে শশীনাথের জুলুম দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে এসে দরিদ্র প্যাসঞ্জারটিকে জিজ্ঞাসা করল, কেন সে টিকিট কাটে নি।

তার দারিদ্র্যের কথা শুনে নিখিল দয়াপরবশ হয়ে নিজের পকেট থেকে পয়সা বের করে তার টিকিট কিনে দিল, এবং তার যাওয়ার জন্যে আনা কয়েকের পয়সা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

শশীনাথ আবার নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে মন দিলেন। শুধুমাত্র বনমালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোদের ছোটবাবু একটা আস্ত পাগল, বনো ! বুঝলি ? মিছিমিছি বোকার মতো আচমকা অতগুলো পয়সা খরচ করে গেল।

বনমালী নিখিলের ব্যাপারে কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত হয় নি। কারণ নিখিলের চরিত্র সে শশীনাথের চেয়েও অনেক বেশী ভাল করে জানে।

বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার তিনি আরও পেলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে তাদের কাছ থেকে দু-চার আনার পয়সা নিয়ে পকেটে ঢোকাতে লাগলেন। যার কাছে পকেট তল্লাস করেও একটি পয়সাও পাচ্ছেন না, তার কাছে অন্ততঃ একটি সিগারেট, কিংবা একটি বিড়ি, অগত্যা এক

টিপ বক্সি জুলুম করে আদায় করেছেন। তাঁর হাত থেকে বিনা মাশুলে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। একটি ঘোমটা-পরা মেয়ে প্যাসেঞ্জার যাচ্ছিল। তার কাছে টিকিট চাইতেই ঘোমটাটা সরিয়ে সে ফিক করে একটু হাসল। শশীনাথের ঐটুকুই লাভ। গদগদ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন।

অদূরে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে নীল চশমা চোখে এবং প্যাণ্ট-কোট-পরা এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খাচ্ছিলেন আর লক্ষ্য করছিলেন শশীনাথের সব কীর্তি। ভিড়ের শেষে তিনিও এগিয়ে এলেন গেটের কাছে।

শশীনাথ বললেন, টিকিট!

তিনি একটি টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন। শশীনাথ খুসী মেজাজে টাকাটা পকেটে গুঁজে রাখতে গেলে ভদ্রলোক তাঁর হাতখানা চেপে ধরলেন। দুপাশে দুজন সাদা পোষাকের পুলিশ কনষ্টেবল এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক শশীনাথের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে তাঁর পরিচয়-পত্রখানা শশীনাথকে দেখাতেই তিনি শিউরে উঠলেন। স্পেশাল পুলিশের লোক। শশীনাথকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল কনষ্টেবল দুজন। বনমালী এগিয়ে এসে বলল, টিকিটবাবু, চললেন কোথায়?

—বেশী দূরে নয়, কাছাকাছি।

—মানে, চতুর্থ পক্ষের শ্বশুরবাড়ী তো?

শশীনাথ কি যেন জবাব দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পুলিশের কাছে গুঁতো খেয়ে সব কথা বলতে পারলেন না। তবু তারই মধ্যে বনমালী শুনতে পেল, তোর দিদি-ভগ্নীপতিকে বলিস্ বনো, যে ষ্টেশনে বেরোলেই দশ টাকার মার নেই।

সাতটি থ্রি ডাউন ট্রেনটা হুস্-হুস্ করে ততক্ষণে প্লাটফর্ম ছেড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। বনমালী ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে একটা হাই তুলল। তারপর ওয়েটিং-রুমে পড়ে-থাকা শশীনাথের জিনিষপত্রগুলো কি করবে, তাই ভাবতে লাগল।

কিন্তু ভাবতে তাকে বেশীক্ষণ হল না। তক্ষুণি একজন পুলিশ এসে সেগুলো তুলে নিল, হয়তো প্রমাণস্বরূপ থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভাগ্যিস্, বনমালী ওসব চোরাই মালে হাত দেয় নি! ভগবান এ যাত্রা খুব জোর তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন!

॥ ছয় ॥

স্বর্ণের জন্মদিন।

সন্ধ্যেবেলায় নিখিল এল তার জন্যে নতুন জামা-কাপড়-জুতোর প্যাকেট নিয়ে। সে ঘরে ঢুকতেই স্বর্ণ তাকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল।

নিখিল বাধা দিয়ে বলল, নাও, এগুলো আগে পরে এস। তারপর ওসব হবে। আগে দেখি, নতুন জামা-কাপড় পরলে কেমন তোমায় মানায়?

মোহন এগিয়ে এসে বলল, তোর কথাই স্বর্ণ এতক্ষণ বলছিল। বলছিল যে, নিখিলদার যা ভুলো মন, নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব ভুলে বসে আছে।

—ভুলো মন হতে পারে, তাই বলে স্বর্ণের জন্মদিনের কথা ভুলব কেন? যাও তো বোন, পোষাক বদলে এস!

—নিখিলদা, আজ তোমাদের খাওয়াব বলে নিজের হাতে রান্না করেছি।

—বেশ করেছ! শুধু রান্নাই নয়, গানও শোনাতে হয় আজ। সেই গানটা আজ তুমি গাইবে, 'আলো চাই আশা চাই'—

—তোমাকে কিন্তু গোড়াটা ধরিয়ে দিতে হবে।

—বেশ তো!

স্বর্ণ খুসী মনে পোষাক বদলাতে পাশের ঘরে গেল। মোহন নিখিলকে বলল, তুই আবার মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ করে জামা-কাপড় আনতে গেলি কেন?

—মিছিমিছি আবার কি, মোহন? এ হতভাগার এ পৃথিবীতে কেউ নেই বলে কি তুই যা-ইচ্ছে তাই বলবি না কি?

বড় গভীর বড় করুণ কণ্ঠে নিখিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার যদি একটা বোন থাকতো-রে!

মোহন জানত না যে, অতি সাধারণ একটা কথা বলতে গিয়ে সে নিখিলের কোন্ বিশেষ দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছে নিজের সম্পূর্ণ

অজ্ঞাতে। তাই নিজের কথা সংশোধন করবার জন্যে সে বলল, তুই অন্য কিছু ভাবিস্ নে ভাই, আমি কিছু মনে করে কোন কথা বলি নি।

স্বর্ণ ওঘর থেকে বলল, নিখিলদা, কৈ গাইছো না কেন? গোড়াটা ধরিয়ে দেবে তো?

নিখিল গাইল প্রথম পংক্তিটি। ওঘর থেকে স্বর্ণ গাইতে লাগল গানটা আর জামা-কাপড় পরতে লাগল। পরা শেষ হল, গানও শেষ হল। সে এ ঘরে এসে দু-ভাইকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বেশ মানিয়েছে তাকে নিখিলের দেওয়া জামা-কাপড়ে।

স্বর্ণ খুব আদর-যত্ন করে দু ভাইকে খাওয়াতে বসল। নিজের হাতের রান্না নিজের হাতে পরিবেষণ করল। তৃপ্তিসহকারে তারা খেলো। খুব মন দিয়ে রান্না করেছে সে। ভালই হয়েছে। শুধুমাত্র মাংস রান্নার সময় দয়ারাম এসে পাশে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

যথাসময়ে দয়ারামও খেতে এল। তাকেও নেমন্তন্ন করেছে স্বর্ণ। এমনিভাবে খুব আনন্দের মধ্যে স্বর্ণের জন্মদিন কেটে গেল।

সরমা অনেক রাত পর্যন্ত জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে বাইরের অন্ধকার বিলটার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে। কানে ভেসে আসে তার মিষ্টি বাঁশীর সুর। নিখিলের বাঁশী। রেল-কলোনীর ঝিলটির পাশে বসে নিশ্চয়ই সে বাঁশী বাজাচ্ছে। ঝিলের পাড়ের নারকেল বনের মাথার ওপর উঠেছে চাঁদ। জোছনায় অবগাহন করছে যেন অদূরে জনবিরল নন্দনপুর ষ্টেশনটা। তাদের কোয়ার্টারের সামনেকার ছোট্ট বাগানটিতে জোনাকির দল ইতস্ততঃভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে। থমথমে রাত্রির বুক চিরে বাঁশীর সুর সঞ্চারিত হয়ে পড়ছে চারদিকে।

সরমার মনটা নিংড়ে যেন বাজছে নিখিলের বাঁশী। মন-উদাস-করা অমন বাঁশী আকর্ষণ করছে সরমার মনটাকে। তার ইচ্ছে হল, শ্রীরাধিকার মতো ছুটে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁশুরিয়ার পায়ের ওপর। কিন্তু কেমন করে তা পারবে? পাশের ঘরে মা শুয়ে রয়েছেন। বাইরের

ঘরের বারান্দায় শুয়ে বনমালী ঘন ঘন কাশছে। হয়তো সে এখনও ঘুমোয় নি। আর একশো বত্রিশ আপ মেল ট্রেনটা পাস্ করিয়ে দিয়ে তার বাবা ফিরবেন কোয়ার্টারে। তার বাবার জন্যে অপেক্ষা করেই সে এতক্ষণ পর্যন্ত জেগে রয়েছে।

তাছাড়া, এত রাত্তিরে অমন পাগলের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় একটি সুদর্শন যুবকের কাছে ছুটে যাওয়াটাও, কেউ জানতে পারলে, শুধু অশোভনই হবে না, কথাটা নিন্দনীয় হয়ে ছড়িয়ে পড়বে নন্দনপুরের প্রতিটি মানুষের কানে।

সরমা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিখিলের কথাই ভাবতে লাগল। উদারমনা সুপুরুষ যুবক। তার বাবারও ইচ্ছে যে, তাদের দুজনের বিয়ে হোক্। শুধু আর্থিক দিক দিয়ে নিখিল একটু দুর্বল। তার রোজগার পরিমিত ও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সামান্য মাইনেটাই সব। তবে সরমা নিজেও তো তার বাবার একমাত্র সন্তান। তার বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের মোটা টাকা সে-ই পাবে। তবু অনেক দূর ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগল সরমা। আজ থেকে দশ বা পনের বছর পরে সে যখন রীতিমত গিন্নী হয়ে উঠবে, তখন নিখিল এ. এস. এম. থেকে বড় জোর ষ্টেশন মাষ্টার হবে। আর সেই কয়েক বছরের মধ্যে সরমা নিশ্চয়ই দু-তিনটি সন্তানের মা হবে। কিন্তু সেই অতি সাধারণ রোজগারে পারবে কি সে তার সন্তানদের উপযুক্তভাবে মানুষ করে তুলতে? মায়ের মন নিয়ে সরমা কত কিছু ভাবল। নিজের জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছায়া সে কোথাও দেখতে না পেয়ে কিছুটা হতাশ হল। নিতান্ত সাধারণ ও মধ্যবিত্ত জীবনের অধিকারিনী হয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে, যদি নিখিলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার মামাবাড়ীর সচ্ছল জীবন সে দেখেছে। সেই প্রাচুর্যের সঙ্গে তুলনা করে সে মনে মনে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ল। তবু নিখিলকে তার ভাল লাগে। স্বামী হিসেবে নিখিলকে নিয়ে নির্বিবাদে সে দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। অর্থ-সামর্থ্যের প্রাচুর্য না থাক, মনোধর্মের জোরে নিখিল আজীবন তাকে আকর্ষণ করতে পারবে।

এমনি কত কী ভাবতে ভাবতে অনেক সময় কেটে গেল। নিখিলের

বাঁশী বন্ধ হয়ে গেছে। সরমাও একটু ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। তার বাবা এসে পড়লেন। মেল ট্রেনটা পাস্ করে গেছে।

রাখালবাবু ফিরলে সরমা শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে সে ভারি মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখল। নিখিলকেই স্বপ্নে দেখল। তারা দুজন যেন নতুন কোন দেশে পাখীর মতো পাখনা মেলে উড়ে গেছে। পাহাড় আর ঝরনায় ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে হারিয়ে ফেলেছে যেন তারা নিজেদের।

সারা রাত অঘোরে ঘুমিয়ে ভোর বেলায় যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন চারদিকে নরম রোদ্দুর ঝিক্‌মিক্ করছে।

আর সেই আশ্চর্য সকালবেলায় নিখিল এল তাদের বাড়ীতে। রাখালবাবুর সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ গল্প করল। সরমা চা তৈরী করে দিল। রাখালবাবু ডিউটিতে চলে গেলে সরমা এসে বসল তার পাশে একটা চেয়ারে। নিখিলকে পকেট থেকে সুন্দর একখানা রুমাল বের করে মুখ মুছতে দেখে সরমা বলল, দেখি রুমালখানা? বেশ নক্সা তোলা, হাতের কাজটা খুব ভাল! কে করেছে এমন সুন্দর কাজ?

—স্বর্ণময়ী!

সরমার মুখখানা নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল? বিশ্রীভাবে সে রুমালখানাকে নিখিলের হাতে ফিরিয়ে দিল। স্বর্ণের প্রতি সরমার অলীক কল্পনাপ্রসূত ঈর্ষাটা নিখিলের আদৌ ভাল লাগল না।

সরমা আবার কথা বলল, স্বর্ণই বুঝি আজকাল তোমায় সব রুমাল উপহার দেয়?

—সব রুমাল দেয় নি, তবে কয়েকখানা দিয়েছে।

—অঃ! সব দেয় নি? ভারি দুঃখ বুঝি তোমার সব রুমাল দেয় নি ?

—দুঃখটা তো দেখছি তোমারই। কিন্তু সরমা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নিজেকে ছোট কর না। স্বর্ণকে আমি নিজের ছোট বোনের মতোই দেখি। সুতরাং তার পক্ষে আমাকে কোনকিছু উপহার দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

—বুঝলাম! ছোট বোনের প্রতি তোমার যে এতখানি দরদ, তা জানতাম না, তবু যদি আপন বোন হত!

নিখিলের দিকে সরমা বিদ্রূপসূচক দৃষ্টি ফেলে উঠে দাঁড়াল।

নিখিলও আর বসে থাকাটা সমীচিন মনে করল না। সে-ও আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

সরমার আদৌ ভাল লাগে না স্বর্ণকে নিয়ে নিখিলের বাড়াবাড়ি। কোন মানুষ যে অনাত্মীয় বন্ধুর বোনকে ঠিক নিজের বোনের মতো দেখতে পারে, এ কথাটাকে সরমা কিছুতেই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারে না। নারীমনের স্বভাবগত ঈর্ষাবোধে সে দুঃখ পায়, নিখিলের প্রতি বিরক্তি বোধও করে। আর নিখিল অবাক হয়ে যায় সরমার এই বিশেষ রূপটি দেখে। তার অবচেতন মনে সে হয়তো সরমাকে সেই জন্যে ছোট মনে করে কিছুটা ঘৃণাও করে। তবু—তবু সে সরমাকে ভাল না বেসে পারে না। সরমাকে নিয়ে সে তার জীবনে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছে। সরমা এরই মধ্যে তার জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার রাজত্ব বিস্তার করে সেখানে মহিয়সী মহিষী হয়ে উঠেছে।

নিখিল কোয়ার্টারে ফিরলেই দয়ারাম বলল, ছোটবাবু, স্বর্ণদিদির অসুখ হয়েছে কাল রাত্তির থেকে।

—অসুখ? কি অসুখ?

—তা তো ঠিক জানি নে। তবে মোহনবাবু বললেন, জ্বর হয়েছে।

—জ্বর?

এক ছুটে নিখিল মোহনের কোয়ার্টারে গেল। গিয়ে দেখল যে, মোহন বোনটাকে একলা ফেলে ডিউটিতে গেছে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে স্বর্ণ। নিখিল ধীরে ধীরে গিয়ে তার বিছানার এক পাশে বসতেই সে পাশ ফিরে তার মুখের দিকে তাকাল। স্বর্ণের মুখখানার দিকে তাকিয়ে নিখিল যেন চমকে উঠল। একি! এ যে বসন্তের ফোস্কায় স্বর্ণের মুখখানা ভরে গেছে! আস্তে আস্তে তার কপালে হাত রেখেই নিখিল বুঝতে পারল যে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে স্বর্ণের।

নিখিলের দিকে তাকিয়ে রোগ-যন্ত্রণায় কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে স্বর্ণ বলল, নিখিলদা, আমি বোধ হয় আর বাঁচব না!

—পাগ্‌লি! ও কথা বলতে নেই। অসুখ-বিসুখ সব মানুষের হয়, আবার ভালও হয়ে যায়, তুইও ভাল হয়ে যাবি!

স্বর্ণের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তার কষ্ট দেখে নিখিলের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠল। নিখিল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। খুব চিন্তায় পড়ে গেল সে। বসন্তরোগের শুশ্রূষাটাই সব চেয়ে বড় কথা। বিশেষ কোন ওষুধ নেই এ রোগের। অগত্যা নিখিল নিজেই অফিসের ছুটি নিয়ে শুশ্রূষা করবে বলে স্থির করল।

কিছু পরে মোহন এল। মোহনও চিন্তামগ্ন। নিখিল মনে মনে শঙ্কিত হলেও, মুখে মোহনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কিছু ভয় নেই, আপনা থেকে সেরে যাবে।

কিন্তু মোহন স্বর্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারল না। এমন সুন্দর মুখখানা বসন্তের ফোস্‌কায় ভরে গিয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছে। দুজনেই বুঝল যে, মারাত্মক জাতীয় বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে স্বর্ণ।

কিছুপরে মোহনকে স্বর্ণের কাছে রেখে নিখিল গেল হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে। তিনি শুনে বললেন যে, শুশ্রূষা যেন ঠিকমত হয়, এবং সম্ভব হলে বিকেলের দিকে তিনি একবার আসবেন।

নিখিল জানত যে, বসন্ত রোগে ডাক্তারদের হাত খুব কম।

বিকেলের দিক রোগ আরও বাড়তে লাগল। স্বর্ণের ছটফটানি ও কাত্‌রানি দুজন বসে বসে যেন আর সহ্য করতে পাচ্ছিল না। তারা, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল আর তাকে একটু আরাম দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। একটা হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে মোহন এসে বসল স্বর্ণের বিছানার সামনে। হঠাৎ স্বর্ণ চেঁচিয়ে উঠল, দাদা সব অন্ধকার দেখছি কেন? উঃ চোখ দুটো বড্ড জ্বালা করছে। উঃ।

—রাত্তির হয়েছে, তাই অন্ধকার দেখছিলি এতক্ষণ। কিন্তু এই তো আলো!

—কোথায় আলো? আমিতো কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, দাদা! শুধু অন্ধকার, নিদারুণ অন্ধকার।

—চোখ মেলে তাকা, বোন।

—চোখ মেলতে পাচ্ছি নে। চোখ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। উঃ।

নিখিল ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, মোহন, তুই আর একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যা। কৈ তিনি তো এখনও এলেন না? কখন আসবেন বলেছিলেন—

মোহন এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল। নিখিল ধীরে ধীরে স্বর্ণের চুলের মধ্যে আংগুল চালাতে লাগল। স্বর্ণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তখনও কাঁদছে।

—কাঁদিস্ নে বোন! কাঁদলে চোখে আরও জ্বালা করবে

—কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছি নে কেন? কই তুমি?

—এই তো আমি। এই যে—

নিখিল বুঝল যে, স্বর্ণের চোখ দুটো বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে। হয়তো সে অন্ধ হয়ে গেছে। হায় বিধাতা, একটি নিরপরাধ নিষ্পাপ ফুলের মতো কিশোরীর চোখ দুটো ছিনিয়ে না নিলে কি তোমার চলছিল না? ঈশ্বরকে ব্যর্থ ধিক্কার দিয়ে উপরের দিকে নিখিল একটিবার তাকাল। তারপর বলল, কাঁদিস্ নে, বোন। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, দেখবি ভাল হয়ে যাবি।

—ঘুম যে আসতে চায় না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে নিখিলদা। আলো চাই, আলো চাই, তুমি শুধু গানই গাইতে পারো আলোর প্রার্থনা জানিয়ে, আলো দিতে পারো না। নিখিলদা, আমি কি অন্ধ হয়ে গেছি? চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখছি কেন? নিরেট জমাট-বাঁধা ধূ-ধূ করা অন্ধকার। আর কিছু নয়, কোথাও আর কিছুই নেই।

আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে স্বর্ণ। কাশল খানিকটা। জ্বর বেড়েছে, নিখিল তা বুঝতে পারল। আবার একবার বিশ্রী কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠল স্বর্ণ। তারপর শিথিল হয়ে গেল তার দেহটা নিখিলের কোলের ওপর।

মৃত্যু! এ কেমন মৃত্যু! নিখিল জানে না একে মৃত্যু বলে। এ যেন অনাবিল শান্তির ঘুম। কয়েক ঘণ্টার রোগ-যন্ত্রণার উদ্দাম ছটফটানির পর অনাবিল বিশ্রাম। এমন করে ঘুমিয়ে মেয়েটা যেন শান্তি পেল।

তার কষ্ট দেখে দেখে নিখিলের বুকের ভেতরের পাথর হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। সেখানেও যেন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

নিথর নিস্পন্দ হয়ে নিখিল মরা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে কতক্ষণ যে বসেছিল, তা সে নিজেই জানে না। চেতনা ফিরে এল তার অনেক রাত্তিরে, যখন মোহন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ঘরে ফিরল।

কিন্তু সবই বৃথা। মোহন প্রথমটা ভেবেছিল, স্বর্ণ ঘুমিয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিখিলের অশ্রুসজল ফ্যাকাসে মুখখানার দিকে তাকিয়ে সে সব বুঝতে পারল, আর ডুকরে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার প্রিয় বোন স্বর্ণের মৃত দেহটার ওপর। ডাক্তার চলে গেছেন অনেকক্ষণ আগে। নিখিল তখনও জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল নন্দনপুরের সান্টিং ইয়ার্ডের দিকে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যে, একখানা ইঞ্জিন একটা কর্কশ হুইস্‌ল্ দিয়ে হুস্ হুস্ করে অনেক দূরে চলে গেল মিছিলটা, তার হেড লাইট ফেলে, আর পেছনে পড়ে রইল গুড্‌স্ ট্রেনের বিরাট ঠিক যেমন করে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে স্বর্ণের প্রাণটা তার ঠাণ্ডা দেহটাকে মাটির বুকে ফেলে দিয়ে।

সারাটা রাত দু বন্ধুতে ঠাঁয়ে বসে রইল। ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে ডাকল না, কাউকে এ দুঃসংবাদ জানানোর মতো মনের অবস্থাও তাদের ছিল না। মোহন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মনে পড়ছিল তার অশৈশব দু-ভাইবোনের জীবনের কত স্মৃতি।

আর নিখিলের বুকখানা যেন ভেঙে গিয়েছিল। সে সব কথা ভুলে গিয়ে ভাবছিল স্বর্ণের কথা। কত দিনের কত ছোটবড় মান-অভিমান স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতি তার মনটাকে পুড়িয়ে যেন খাঁক করে দিচ্ছিল। একটা চাদরে স্বর্ণের দেহটাকে ঢেকে দিয়ে সে সেই খাটের ওপরেই বসে তাকিয়ে ছিল সামনের জানলাটা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হল, আকাশের বুকে ফুটে উঠেছে নতুন আলোর আভা। দিনের আলোর আগমনের সাড়া। এমনিতর একটু-খানি আলোর জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে কত কেঁদেছে স্বর্ণ। এতটুকু আলো সে পায় নি। তাই বুঝি অভিমান করে সে চলে গেল। আকাশের আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল নিখিল। তাকাল মোহনের

দিকে। মোহন তখনও ঠিক তেমনি করে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঘরের দেওয়ালের এক কোণে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে।

এবার নিখিল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পা দুটো যেন তার টলছে। এক রকম টলতে টলতেই সে মোহনের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে তাকে টেনে তুলল। মৃতের সৎকার করতে হবে তো!

স্বর্ণের মৃত্যুর পর নিখিল যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। তার অভিশপ্ত জীবনে সে স্নেহ-ভালবাসা যেটুকু পেয়েছে, তা মোহন ও স্বর্ণ—এই দুই ভাই-বোনের মধ্যেই পেয়েছে। ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে দূর সম্পর্কের এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে সে মানুষ হয়েছে। তারপর সামান্য লেখাপড়া শিখে রেলের চাকরিতে ঢুকেছে। এই তো তার ছোট্ট জীবনটুকুর পরিমিত ইতিহাস। এর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক তার ছিল ওদের দু ভাই-বোনের সঙ্গেই। তাই স্বর্ণ পালিয়ে গিয়ে তাকে অনেকখানি আঘাত দিয়েছে।

কাজ-কর্মে মন বসছে না। নির্জন ঘরের মধ্যে আপন মনে বসে স্মৃতির রোমন্থন করা ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগছে না। এতদিনে সে যেন সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারল, স্বর্ণকে সে কতখানি স্নেহ করত, সে-কথা। স্বর্ণের স্মৃতি তার প্রতিটি শ্বাস-প্রঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

দয়ারাম এসে সামনে দাঁড়াল। বুঝতে পারল সে ছোটবাবুর মনটাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বলল, ছোটবাবু ডিউটিতে যাবেন না?

খুব আস্তে ছোট্ট করে জবাব দিল নিখিল, যাব।

আর কোন কথা বলে নিখিলের বিরক্তিভাজন হতে চাইল না দয়ারাম। সে কেবিনের দিকে গেল। সে জানে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটবাবু ডিউটিতে আসবেন। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কোন ট্রেন নেই। এ সময়টুকু সে একলাই কেবিনের কাজ চালিয়ে নিতে পারবে, যদি ছোটবাবুর আসতে একটু দেরী হয়ও। তার একবার ইচ্ছে হয়েছিল যে বলে, আজ না হয় থাক্‌, ডিউটিতে গিয়ে কাজ নেই, মনটা যখন খারাপ!

কিন্তু ভরসা পায় নি কিছু বলতে। কারণ ছোটবাবুর একগুঁয়েমির কথা জানতে তার কিছু বাকি নেই। একটিবার যেটি তিনি ভাববেন বা বলবেন, তা তিনি করবেনই! তাই দয়ারাম এক কথায় চলে গিয়েছিল ছোটবাবুকে একাকী থাকতে দিয়ে।

নিখিল আরও অনেক সময় ধরে তেমনি করেই বসে রইল।

সরমা এসে ঢুকল তার কোয়ার্টারে। নিখিলকে স্তব্ধ ও ম্লান দেখে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে তোমার?

—কিছু না!

নিখিল ফিরে এল তার সৃষ্টি-করা সেই বিশেষ পরিবেশময় বিশেষ জগৎ থেকে। সরমা ব্যস্ত পায়ে তার আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, এ কি? চেহারাটাকে দুদিনেই কি করে ফেলেছ? ইস্! এ যে তিন মাস ধরে জ্বরে ভোগা রোগীর চেয়েও দুর্বল দেখাচ্ছে!

নিখিল কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না এ কথার। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সরমা আবার কথা বলল, শোন, আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন। বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমায় বলতে।

—হঠাৎ নেমন্তন্ন কিসের?

—এমনি। তেমন বিশেষ কোন উপলক্ষ্য নেই। মামাবাবু এসেছেন কলকাতা থেকে। অনেক খাবার-দাবার নিয়ে এসেছেন। অত সব খাবে কে? আমরা তো তিন জন মাত্র মানুষ। তাই বাবা বললেন—

—তাই বলে আমাকে—

—বেশ, তোমার অত যদি আপত্তি থাকে তো খেয়ো না! নিজের হাতে ভালমন্দ দুটো রেঁধে যে খাওয়াব, তাতো তোমার পছন্দ নয়!

সরমার অভিমান-ক্ষুব্ধ মুখখানার দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, পছন্দ নয়, এ কথা কি আমি বলেছি?

—রাত্তিরে আসছ কিনা বল।

—আসব!

নিখিল মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করল। সরমা মোহাবিষ্টের মতো কয়েক মুহূর্ত নিখিলের সৌম্য মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাত্তিরে রাখালবাবুর বাড়ীতে যেতে নিখিলের একটু দেরী হল। তার দেরী দেখে রাখালবাবু খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বারবার ঘরের দরজার দিকে তাকাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মনোরমা আসন পেতে গ্লাসে জল গড়িয়ে সাজিয়ে রেখেছেন, যাতে নিখিল এলেই তাঁরা একসঙ্গে খেতে বসে যেতে পারেন।

রাখালবাবু মনোরমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কই, নিখিল তো এখনও আসছে না ?

—তোমরা বসে পড়। আর কত রাত করবে? নিখিল না-হয় পরেই খাবে'খন।

—তা কি করে হয়! নেমন্তন্ন করে ডেকেছি তাকে, আর আমরা আগে বসে পড়ব ?

—রাত তো কম হয় নি ? যদি সে না-ই আসে ? তা'হলে কি উপোস দিয়ে থাকবে তোমরা ? দাদার তো আবার বেশী রাত করে খাওয়াই অভ্যেস নেই।

ধনী সম্বন্ধী সদানন্দের দিকে একবার তাকালেন রাখালবাবু। তিনি মেজাজসহকারে চেয়ারে বসে একটি চুরুট সেবন করছেন।

সরমাকে রাখালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তুই ভাল করে তাকে বলেছিলি তো, মা ?

—হ্যাঁ, আমি নিজে গিয়ে তাকে বলে এসেছি।

সদানন্দ এবার কথা বললেন, বেশ তো, আমরা ধীরে ধীরে সুরু করি, এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই এসে পড়বে। মনো, তুই এক পাশে বরং তার জন্যে একটা জায়গা করে রাখ্!

—বেশ তো, সেই ভাল। তোমরা বসে পড়, দাদা!

রাখালবাবু ও সদানন্দ খেতে বসলেন। মনোরমা নিজের হাতে তাঁদের পরিবেষণ করতে লাগলেন।

—আর একটু ঝোল দিই দাদা! ও ভাত কটা মেখে নাও!

—আরে, না না, এত কি আজকাল আর খেতে পারি ? বয়স তো কম হল না ? কি বল হে, রাখাল!

—গল্প করে বেড়ানোর মতো বয়স নিশ্চয়ই তোমার হয়নি! তোমার বোন যখন এত করে বলছে, তখন আর একটু ঝোল নাও-না!

এমন সময় নিখিল বাইরের ঘরের বারান্দায় এসে উঠল। মামাবাবুর কণ্ঠ কানে আসতেই আপনা থেকে সে থমকে দাঁড়াল সে সেই অন্ধকারের মধ্যে। মামাবাবু বলছেন, সরমা তো চমৎকার রান্না করতে শিখেছে, মনো?

রাখালবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, রাঁধে আমার মা ভালই।

—মেয়েটা যে এরই মধ্যে এত বড় হয়েছে, তা যেন বিশ্বাসই হয় না। এই তো সেদিনও ছিল ঠিক এইটুকুটি। তা, ওর বয়স কত হল-রে মনো?

—এই কার্তিকে কুড়িতে পড়বে। এখন উনিশ বছর চলছে।

—ওর বিয়ে-থা'র কোন রকম চেষ্টা করছিস?

—কোথায়-বা আর চেষ্টা করি? কে-ই বা পাত্র খুঁজে দেয়, দাদা? ভাল পাত্র না পেলে মেয়েটাকে তো আর যেখানে সেখানে ফেলে দিতে পারি নে?

—এমন সোনার মেয়েকে যেখানে সেখানে দিতে যাবিই বা কেন?

নিখিল এমন আলোচনার মাঝখানে ঢুকতে ইতস্তত: বোধ করতে লাগল। অপরের একান্ত পারিবারিক কথোপকথন থেকে দূরে থাকাই তার উচিত। তাই সে ভাবল যে, কিছুক্ষণ পথের ওপর পায়চারি করে ফিরে এসে তার খাওয়া উচিত। সে নামতে যাবে পথে, এমন সময় শুনতে পেল সে রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর। তিনি সরমার বিয়ের প্রসঙ্গে নে তার কথাই পেশ করছেন বলে তার মনে হল। তাই এতক্ষণের পারিবারিক আলোচনায় তার নিজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় সে সেখানে সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা আর দোষণীয় বলে মনে করল না।

রাখালবাবু বলছেন, একটি বড় ভাল ছেলে আছে এই নন্দনপুরেই। মোটামুটি আমি একরকম ভেবে রেখেছি যে, সরমার বিয়ে আমি তার সঙ্গেই দেব!

ভয়ে ভয়ে তাকালেন তিনি গিন্নীর মুখের দিকে। গিন্নীর চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল। সরমা সেখান থেকে অনেক আগেই রান্নাঘরের মধ্যে লজ্জা পেয়ে সরে গিয়ে কান পেতে সব শুনছিল।

—কেমন ছেলে, শুনি?

রুই মাছের মাথাটা চিবোতে চিবোতে সদানন্দ প্রশ্ন করলেন।

রাখালবাবু মৃদু হেসে বললেন, তুমি তাকে এক্ষুনি দেখতে পাবে। তাকেই আজ আমার এখানে নেমন্তন্ন করেছি। ছেলেটি এখানকার একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার।

—আরে দূর দূর, এ, এস. এম ? পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের একটা এ. এস. এম-কে শেষে এমন ভগবতীর মতো মেয়েকে দেবে ? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? তুই কিচ্ছু ভাবিস্ নে মনো, তোকে আমি ভাল পাত্র এনে দেব !

—তাই দাও-না দাদা ! আমার কি ইচ্ছে হয় না যে, মেয়েটা ভাল ঘরে-বরে পড়ুক !

—আরে, যার কথা আমি বলছি, সে চমৎকার পাত্র। সবে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে। কলকাতায় নিজস্ব বিরাট বাড়ী। ভাল ঘর। আমার ছোট সম্বন্ধীর একজন বিশিষ্ট বন্ধু পাত্র স্বয়ং। এমন সুন্দরী মেয়ে আমাদের। এক কথায় বিয়ে হয়ে যাবে।

রাখালবাবু খুব নরম গলায় বললেন, কিন্তু দেনা-পাওনা বেশী কিছু হলে তো আমার পক্ষে—

—কিছু ভেব না, রাখাল। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যখন এত জোর দিয়ে বলছি, তখন ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও-না কেন ?

—বেশ তো দাদা, দাও-না বিয়েটা দিয়ে। তোমার ভগ্নীপতির মাথায় কি যে এক পাত্র ঢুকে বসে আছে, তা আর বলতে পারি নে। কোথাকার কে, তার ঠিক নেই। সামান্য চাকরি। আমার এমন সোনার প্রতিমার মতো মেয়েকে কিছুতেই এমন করে বিসর্জন দিতে পারব না, দাদা। তুমি সেই ডাক্তার-পাত্রকেই দেখো !

—এ বিয়ে এক রকম ঠিক হয়েই গেছে বলে ধরে নে। ওষুধের ব্যবসায় নেমে আজ পঁচিশ বছর ধরে নিছক বিজ্ঞাপনের জোরে কত বাজে ওষুধের চাহিদা বাড়িয়ে এত পয়সা রোজগার করলাম, আর নিজের সুশ্রী চেহারার ভাগ্নীর সামান্য একটা বিয়ে দিতে পারব না ?

মনোরমা খুসী মনে এক গাল হেসে বললেন, তুমি আবার কোন্ কাজটা না করতে পার ? ইচ্ছে করলে তো সবই পার।

এমন আলোচনা যেখানে এত গভীরভাবে হচ্ছে, সেখানে নিখিলের পক্ষে ঢোকা শুধু অনভিপ্রেতই নয়, অসম্ভব। নিখিল আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াতে পারল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল অপমানাহতের ভাব।

এক নিঃশ্বাসে দুম্‌দাম্‌ করে পা ফেলে সে তার ঘরে এসে ঢুকল। তারপর কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকার বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। সবকিছু ছাপিয়ে সরমার কথা তার স্পর্শী মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে ভাবতে লাগল, সরমাকে ছাড়া কেমন করে তার জীবন চলবে। মনে মনে সে তার জীবনে একটি নারীকেই কামনা করেছে—সরমাকে। সেই সরমাকে সে তার জীবনে পাবে না, সে চলে যাবে অন্য মানুষের জীবনে চিরদিনের মতো—এই বিশেষ অনুভূতিটি তাকে রীতিমত পীড়া দিতে লাগল। প্রেমের যে এমন নিদারুণ জ্বালা, তা ইতিপূর্বে এমন করে অনুভব করার সুযোগ বা অভিজ্ঞতা লাভ তার ঘটে নি। সরমাহীন নির্দয় পৃথিবীটা যেন তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। স্বর্ণের জন্যে মন কাঁদে, সে এক ধরণের কান্না। আর সরমার জন্যও মন কাঁদে, এ অন্য কান্না। এ কান্নায় ঈর্ষা আছে, আক্রোশ আছে, কামনা আছে। নিখিল তা এতদিনে বুঝতে পারল। নিখিল যদি সরমাকে নিষ্কাম দৃষ্টিভঙ্গীতে ভালবাসত, তাহলে সে আধ্যাত্মিক প্রেমের মতো উচ্চ প্রেরণায় খুব সহজেই হাতআত্মত্যাগ করতে পারত। এমনি করে তার মনটা আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে মরতো না। সে যে ঈর্ষা করছে সরমার ভাবী স্বামীকে, নিজের অবচেতন মনে সরমার দেহ-মনকে এমন গভীরভাবে কামনা করে রয়েছে, সে যে এই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যবস্থাটা করার জন্যে মনে মনে মামাবাবুর প্রতি একটা আক্রোশশীল হয়ে উঠতে পারে, এই সত্য তথ্যটি সে সরমাকে হারানোর ভয় পাবার আগে কখনও নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে নি। অনেকদিন স্বর্ণকে মিথ্যে ঈর্ষা করবার জন্যে সরমাকে সে 'ছোট মন' বলে শাসন করেছে। আর আজ নিজেই অতি সাধারণ মানুষের মতো সে অনেক নীচেয় নেমে এসে জীবনের ঘূর্ণি পথের মোড়ে এসে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নিজের মনের চেহারাকে প্রত্যক্ষ করে সে নিজেকে বারবার ধিক্কার দিল, ঘৃণা করল, শাসন করল। কিন্তু

তার মন যেন আর তার আয়ত্তাধীন নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে সে—কোন্ তেপান্তরের মাঠের আলেয়ার মিছিলের মাঝখানে সে কি যেন খুঁজে মরছে। সরমাকে কি সেখানে কেউ কখনও ধরে রাখতে পারে?

আর সরমা মায়ের পাশের আসনে বসে ভাল করে খেতে পারল না। দু-এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে উঠে পড়ল।

মনোরমা বললেন, ওকি, সবই তো ফেলে রেখে গেলি? খেলি নে যে?

—খেতে ভাল লাগছে না।

—কেন, হল কি? রান্না তো বেশ হয়েছে।

—শরীরটা ভাল লাগছে না।

হাত-মুখ ধুয়ে উঠে এসে নিখিলের জন্যে যে আসন পাতা ছিল, সেটা তুলে রাখল। যে গ্লাসে জল ভরা ছিল, সে গ্লাস থেকে জলটা ঢেলে ফেলতে গিয়ে একবার থম্‌কে দাঁড়াল। ফেলে দিতে মনটা খচ্ করে উঠল। মানুষটা এল না! এলে, এই আসনে সে বসত, এই গ্লাসে সে জল খেত। আর সরমার নিজের হাতের রান্না সে খেত, যে-রান্না খেতে খেতে মামাবাবু কত প্রশংসাই করলেন!

সদানন্দ শুয়ে পড়েছেন। রাখালবাবু খেয়েই চলে গেছেন ষ্টেশনে। শেষ ট্রেনটা পা'স্ করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে এসে ঘুমোবেন।

নিখিল এখনও যখন এল না, তখন আর আসবে না। রাত প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। এত রাত্তিরে কেউ আবার কারো বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে যায় নাকি?

সারাদিনের খাটাখাটুনি আর মানসিক অস্বস্তিতে সরমার নিজেকে খুবই ক্লান্ত লাগছিল। সে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিল। বিছানায় শুয়ে সে-ও নিখিলের মতো ছটফট করতে লাগল। নিখিলের প্রতি মনে মনে সে নিদারুণ অভিমান পোষণ করতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, এত অহংকার নিখিলের কিসের? সে নিজে গিয়ে এত করে বলে এল, তবু সে এল না? এমনি করে নিখিল তাকে অপমান করল?

তার আরও মনে পড়তে লাগল মামাবাবুর দৃঢ় কণ্ঠের কথাগুলো।

"পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের একটা এ. এস. এম-কে শেষে এমন ভগবতীর মতো মেয়েকে দেবে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?......"

কথাগুলো বারবার পাক খেয়ে খেয়ে তার কানের কাছে এসে যেন বাজতে লাগল। ভাল লাগল না। আরও কিছুক্ষণ অন্ধকার ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে কখন যে সে সারা দিনের ক্লান্তির ভারে ঘুমিয়ে পড়ল, তা সে জানতেও পারল না।

রাত পোহাবার প্রায় সাথে সাথেই ধীর পদে নিখিলের সামনে এসে মাথাটা নীচু করে মোহন দাঁড়াল। নিখিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নিস্পন্দ-হৃদয় হয়ে গেল। সে জানে যে মোহন তার কাছে বিদায় নিতে এসেছে। মোহন বদ্‌লি হয়ে নন্দনপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, নিখিল যেন মনে-প্রাণে তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। স্বর্ণ নেই, মোহন থাকবে না, এই নন্দনপুরের বুকে হয়ত সে নিজেও একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবার সব শক্তি হারিয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে কালের চাকার তলায়।

তবু খুব ক্ষীণ কণ্ঠে সে অনেক চেষ্টা করে একটি ছোট্ট প্রশ্ন করল, কোন্ গাড়ীতে যাবি?

—নটা চল্লিশের গাড়ীতে।

মোহন উঠে দাঁড়াল। নিখিলও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তার পেছন পেছন এই প্রথম সে মোহনের কোয়ার্টারে গেল স্বর্ণের মৃত্যুর পর। এতদিন সে ইচ্ছে করেই সেখানে যায় নি, স্বর্ণের স্মৃতিদহন থেকে দূরে সরে থেকে নিজেকে নানা কাজে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে।

স্বর্ণের ঘরে পা দিয়েই তার মনটা আবার কেঁদে উঠল। এই ঘরের এইখানের এই খাটে স্বর্ণ হারিয়ে গেছে।

মোহনের বিছানাপত্র সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। ঘরের এক কোণে সে জড়োসড়ো করে রেখেছে সেগুলোকে। পোষাক পরতে পরতে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল মোহন। আর আধ্ ঘণ্টা বাকি ট্রেনটা আসতে।

যথাসময়ে কেবিনম্যান মনোহর এসে বিছানাপত্র সুটকেশ ইত্যাদি নিয়ে প্লাটফর্মে গেল। নিখিলও মোহনের সঙ্গে ষ্টেশনে গেল। মোহন

ষ্টেশনের অন্যান্য ষ্টাফের কাছ থেকে বিদায় নিল, রাখালবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে ফিরে এল প্লাটফর্মের এদিকটায়, যেখানে নিখিল দাঁড়িয়ে ছিল।

ইতিমধ্যে ট্রেনটা এসে গেল। মনোহর জিনিষপত্রগুলো সযত্নে ট্রেনের কামরায় তুলে দিল। মোহন ট্রেনে গিয়ে উঠল। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। নিখিল তাকিয়ে রইল চলমান ট্রেনটার দিকে। ট্রেনটা দূর থেকে দূরে চলে গেলে নিখিলের বুকখানা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। এতদিনের এত ঘনিষ্ট বন্ধু আজ হঠাৎ এমনি করে তাকে ছেড়ে রইল। আপনা থেকে তার বুকের অন্তঃস্থল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সে নিজেকে বড় বেশী দুর্বল, বড় বেশী অসহায় বোধ করতে লাগল। পা যেন আর চলতে চায় না!

ধীরে ধীরে হেঁটে নিখিল তার কোয়ার্টারে ফিরে ঘরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় সরমা দরজার পেছন থেকেই ডাকল, শোন!

নিখিল পেছন ফিরে নির্লিপ্তভাবে সরমার দিকে তাকাল। সরমা দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কাল রাত্তিরে গেলে না কেন?

নিখিল তার কণ্ঠস্বর শুনে বিরক্তি বোধ করে নিরুত্তর রইল।

—জবাব দাও!

—শরীর ভাল ছিল না।

—একবার গিয়ে বলে এলেই হত? কথা বলছ না যে?

নিখিল মুখ ফিরিয়ে নিল দেখে কোমলতর হয়ে এলে সরমার কণ্ঠস্বর।

—অপেক্ষা করে করে শেষে তুমি গেলে না যখন, কি খারাপই যে তখন লাগছিল!

সরমা নিখিলের আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, রাগ হয়েছে? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে! কিন্তু আমি তো কিছু—

সরমা আস্তে আস্তে নিখিলের হাতখানা চেপে ধরল। নিখিল একটা ঝট্‌কানি দিয়ে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল। সরমার খুব রাগ হল।

—এত অহঙ্কার কিসের?

—অহঙ্কার থাকবে না-ই-বা কেন? তোমারও তো রূপের অহঙ্কার কম নয়?

—আমার তবু তো রূপও অন্ততঃ আছে। কিন্তু কি আছে তোমার? রূপ, গুণ, অর্থ, সামর্থ্য, কোন্‌টা আছে?

রাগে ফুলতে লাগল সরমা।

—কি বললে?

শুধুমাত্র কঠিন মর্মাহত ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সরমার দিকে নিখিল তাকিয়ে রইল। সরমা সেখানে দাঁড়াতে পারল না। নিখিলকে সে যে এমন করে অপমান করতে পারবে, তা সে নিজেই জানত না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আর বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল নিখিল অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই দরজাটার সামনে।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে খুব কাঁদল সরমা। কেঁদে কেঁদে সারা হল। কেন সে অতগুলো বাজে কথা নিখিলকে বলতে গেল? কেন?

॥ সাত ॥

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। নিখিল এবং সরমার দেখা হয় নি। নিখিল বা সরমা কেউ কারো কোন খবরও নেয় নি।

ইতিমধ্যে নিখিল একখানা চিঠি পেল তার জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে। তাঁর বড় ছেলের বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ। নিখিলকে মানুষ করেছেন জ্যাঠামশাই। তাছাড়া, অমল আর সে একই সঙ্গে লেখাপড়া করেছে। অমলের বিয়েতে সে না গিয়ে থাকতে পারে কেমন করে? সে বহরমপুরে রওনা হয়ে গেল দিন দশেকের ছুটি নিয়ে।

অমলের বিয়েতে গিয়ে খুবই আমোদ করে তার ভাঙা মনটা অনেকখানি জোড়া লেগে গেল। অনেকখানি সুস্থ হয়ে সে ফিরে এল দশ দিনের জায়গায় পঁচিশ দিন কাটিয়ে। নন্দনপুরে ফিরে এসে সে একবার ভাবল যে, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। কারণ অনেকদিন ইচ্ছে করেই সে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নি। অথচ তিনি তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। সে তাই বেরোল কেবিন থেকে। প্লাটফর্মের ওপরই বনমালীর সঙ্গে তার দেখা হল।

—ছোটবাবু, সিগারেট আছে? সিগারেট?

—নেই। তারপর, তোদের খবর কি?

—খবর তো এখন ঐ একটাই!

—কিসের?

—দিদিমণির বিয়ের।

—বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে?

—সব ঠিক। এই তো এই মাসের সাতাশ তারিখে হবে। এই সেদিন পাকা-দেখা হয়ে গেল।

—তাই নাকি? কোথায় ঠিক হল? পাত্র কি করে?

নিখিল বনমালীর কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

—কলকাতার মস্ত বড় ডাক্তার। মামাবাবু সব জানেন। উনিই তো সব ঠিক করে দিলেন।

—ও:!

নিখিল আর সেখানে দাঁড়াল না। দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে গেল। বড়বাবুর সঙ্গে এখন তার দেখা না করাই ভাল। সে তার কোয়ার্টারের পথ ধরে চলতে লাগল।

বনমালী হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

বহরমপুর থেকে যতটুকু সুস্থ হয়ে সে এসেছিল, নন্দনপুরে এসে বনমালীর মুখে সরমার বিয়ের কথা শুনে তার চেয়ে বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাঁশীটা হাতে নিয়ে বাজাতে তার মনটা চাইল না। এত সখের বাঁশের বাঁশীটা সে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে টান মেরে। বাঁশীটা ভেঙে গেল। তার জীবনে যে ভাঙন লেগেছে স্বর্ণের মৃত্যুর দিন থেকে, কবে এবং কোথায় গিয়ে তার শেষ হবে, কে জানে! নিজের আজন্ম দুঃখী জীবনের কথা ভেবে ভেবে সে ক্রমশঃ কাতর হয়ে পড়ল। আর বুঝি সে গাইতে পারে না মন খুলে উদাত্ত কণ্ঠে, 'আলো চাই আশা চাই, জীবনের পথে বাঁচার মতো এতটুকু ভালবাসা চাই।' এই প্রার্থনা যদিও-বা সে গায়, এখন তা তার কণ্ঠে আর দাবীর মতো শোনাবে না, শোনাবে হয়তো মিনতিময় ভিক্ষে চাওয়ার মতোই। সে আজও পায় নি, কোনদিনই হয়তো তার জীবনে আলো, আশা, ভালবাসা—কিছুই পাবে না। তাই সে আর 'জীবন জীবন' করে কাঁদবেও না। স্বর্ণ মরেছে আলোর তৃষ্ণায়, আজ সে-ও শুকিয়ে যেতে বসেছে আলোর মরিচীকার প্রলোভনে। নিজের জীবন নিয়ে এ কি খেলা সে খেলেছে?

সন্ধ্যের দিকে রীতিমত জ্বর হল তার। নানা রকমের দুঃস্বপ্নের ভেতর প্রলাপ বকতে লাগল সে। দয়ারাম তার অসুখ দেখে তার ঘরেই শুয়েছিল। তার কণ্ঠের সাড়া পেয়ে উঠে তার কাছে এল। মনে হল, সে যেন স্বর্ণের অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথা বলছে, গান গাইছে।

দয়ারাম মৃদু ধাক্কা দিয়ে নিখিলের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তার বড় ভয় করছিল ছোটবাবুর অবস্থা দেখে।

—ছোটবাবু, কি হয়েছে? অমন করছেন কেন?

ঘুম জড়িত কণ্ঠে সে বলল, স্বর্ণ এইমাত্র আমার কাছে এসেছিল, এসে বলল, গান শুনব। তাই—

—ছোটবাবু, চোখ খুলুন! আপনার ঘুম ভেঙেছে?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ! কি বলছিস তুই? অত চেঁচাচ্ছিস কেন?

—ডাক্তার ডাকব? জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে একেবারে?

—রাত কত হল?

—খুব বেশী নয়। কেন?

—তোদের বড়বাবুর মেয়ের বিয়ে কবে রে?

—আসছে কাল।

—অ:!

সম্পূর্ণ সজ্ঞানে যে ছোটবাবু কথা বলছেন না, দয়ারাম তা বুঝতে পারল।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে বিয়ে-বাড়ীতে সানাই প্রথম এসেই খুব জোরে বাজাতে সুরু করে দিল। রাত্তিরের বাজনা নিখিলের ঘর থেকে স্পষ্টই শোনা যায়।

—সানাই বাজছে কেন?

—দিদিমণির বিয়ের সানাই। আজ যে দিদিমণির গায়ে-হলুদ! কলকাতা থেকে দিনের বেলায় সানাই এসে পৌঁছোয় নি। তখন শাঁখ বাজিয়েই দিদিমণিকে স্নান করানো হয়েছে। এখন বোধ হয় সানাই এসে পৌঁছেচে, তাই বাজাচ্ছে। আজ রাত্তিরেই মামাবাবু এসে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে দিদিমণিকে নিয়ে যাবেন! সেখানেই বিয়ে হবে।

—শুনেছি·· শুনেছি...একটু চুপ কর্ তো? দেখছিস্ জ্বরে মরছি!

—অন্যায় হয়ে গেছে, ছোটবাবু!

—উ:, একটু জল দে! একটু জল—

—দিচ্ছি, ছোটবাবু!

দয়ারাম জল দিলে তা খেয়ে নিয়ে ছটফট করতে লাগল নিখিল। সানাই আরও জোরে বাজতে সুরু করেছে।

কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে নিখিল বলল, জানলাটা বন্ধ করে দে···সব দরজা-জানলা বন্ধ কর্!

দয়ারাম তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সব জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে দরজাটা শুধু খোলা রাখল বাতাস চলাচলের জন্যে। ফিরে এসে নিখিলের কাছে বসে দয়ারাম বলল, ছোটবাবু, আপনি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন। রাত্তিরে আজ আর ডিউটি করে কাজ নেই। আমি বড়বাবুকে জানিয়ে দেব'খন আপনার অসুখের কথা। পরে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবেন।

—তুই পাগল হয়েছিস, দয়ারাম? আজ সরমা বিয়ে করতে কলকাতায় যাচ্ছে। আর আমি শুয়ে থাকব রোগ-শয্যায়? আমি কেবিনে শুয়ে শুয়ে তার বিয়ের বেশ দেখব না? তা হয় না, দয়ারাম। তুই কিছু ভাবিস্ নে। আমার কিছু হয় নি। আমি খুব ভাল আছি!

নিখিল কথা বলছে আর নেশাখোরের মতো যেন টলছে। দয়ারাম কোনদিন তাকে এমন বিচলিত খেয়ালী ও বেচালের দেখে নি। নিখিলের অসুস্থতার কথাই সে বেশী করে ভাবছিল। আবার ডাক্তার ডাকতেও সে দেবে না। দয়ারাম মনে মনে তাকে সমীহও করে। সে অসুস্থ হলেও তার বিনানুমতিতে নিজের খুশী মতো কোন কাজ করলে সে তা কখনই সমর্থন করে না, দয়ারাম তা জানে। তাই ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে বৃথা হাঙ্গামা বাধাতে সে চাইল না। কারণ নিখিলের 'না' মনে 'না'-ই।

সারাদিন নিখিল বিছানায় শুয়ে রয়েছে। জ্বর তেমন ছিল না। শরীরটা একটু হালকা হালকা লাগছিল। তবে মাথার ভেতরটা প্রায় সারা ক্ষণই ঝিমঝিম করছিল। সারা দিনের মধ্যে সে কিছুই খায় নি। দয়ারাম বার্লি তৈরী করে দিয়েছিল। বাটিসুদ্ধ বার্লি সে টান মেরে ফেলে দিয়েছিল।

আবার সানাই বাজছে। বিয়ে বাড়ীর সানাই। তার সুরের ভেতর নিখিল শুনতে পাচ্ছে যেন কার কান্না। কি করুণ, কি মর্মান্তিক সে কান্না! নিখিলের বুকের ভেতরটা সানাইয়ের সুরে মোচড় খেয়ে উঠতে লাগল। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে ছিল ঘরের নিরেট দেয়ালের গায়ে। আর তার ম্লান চোখ দুটো থেকে নিজের অজ্ঞাতেই ঝরে পড়ছিল অশ্রুধারা।

ঘনতর হয়ে রাত্রি নেমে এসেছে নন্দনপুরের বুকে। ঝিলের পাড়ের নারকেলবনের মাথা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে শীতের প্রারম্ভে কুয়াশার আমেজে। রাত আটটা থেকে নিখিলের ডিউটি। দয়ারাম আর একবার বলল, ছোটবাবু, আজ আর আপনার ডিউটিতে গিয়ে কাজ নেই। আপনি ছুটি নিন।

—আজই তো আমার শেষ ডিউটি করবার দিন।

—কেন?

—কাল থেকে আমি নন্দনপুর ছেড়ে চলে যাব।

—কোথায় যাবেন?

—জানি নে! নন্দনপুর আর ভাল লাগছে না। স্বর্ণ নেই, মোহন নেই এখানে, কিসের জন্যে কার জন্যে এখানে থাকব, বলতে পারিস্?

দয়ারাম একথার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। স্বর্ণ বা মোহনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা দয়ারামের কিছুই অবিদিত নয়।

হঠাৎ দয়ারাম ব্যস্ত হয়ে তার নীল ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা হল্‌দে রঙের খাম বের করল।

—ছোটবাবু, দিদিমণির বিয়ের এই নেমন্তন্নের চিঠিটা কাল বড়বাবু আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'দয়ারাম আমি তো নানা কাজে ব্যস্ত, তাই নিজে গিয়ে বলতে পারলাম না, তুই আমার নাম করে তোর ছোটবাবুকে এই চিঠিখানা দিবি। সে যেন অবশ্যই আসে।'

চিঠিখানা হাতে নিয়ে নিখিল একটু হাসল। তারপর মাথার বালিশের পাশে রেখে দিল।

রাত আটটা প্রায় বাজে। টলতে টলতে নিখিল উঠে দাঁড়াল।

দয়ারাম বলল, সত্যিই কি আপনি ডিউটিতে বেরোচ্ছেন?

—হ্যাঁ, বলছি তো একশোবার! তুই ভাবিস্ নে। তুই সঙ্গে থাকলে, আমার ডিউটি করতে কিছু কষ্ট হবে না। তোকে যেমন বলব, তেমন সিগন্যাল টানবি। কাজটা এমন আর শক্ত কি?

—কিন্তু—

—নে নে, কম্বলটা নিয়ে চল্, শুয়ে শুয়েই ডিউটি করব। বুঝ্‌লি!

কেবিনে যথা সময়েই ধীরে ধীরে গিয়ে তারা পৌছল। নতুন এ. এস এম. বিকাশবাবু নিখিলকে অমন অবস্থায় দেখে বললেন, আপনাকে যা অসুস্থ দেখেছি, এ অবস্থায় আপনার বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল, নিখিলবাবু!

দয়ারাম বলল, কত করে তো নিষেধ করলাম। শুনতে কি চান?

নিখিল কোন কথা বলল না। কম্বলটা পাতা হলে শুয়ে পড়ল। বিকাশবাবু আর বৃথা সময় নষ্ট না করে চলে গেলেন। দয়ারাম তার টুলটার উপর বসে ষ্টেশনটার দিকে তাকিয়ে রইল। সানাইয়ের ক্ষীণ সুর মাঝে মাঝে বিয়েবাড়ী থেকে ভেসে আসছে।

—কটার ট্রেনে সরমা যাবেরে, দয়ারাম?

—ন'টা পনেরোর গাড়ীতে।

—তাই নাকি?

—বড়বাবু তো তাই বলছিলেন।

—এখন কটা বাজে?

—সাড়ে আটটা।

—তা হলে এখনও অনেক দেরী!

—হ্যাঁ, অনেক দেরী!

নিখিল চোখের পাতা বুজে চুপ করে শুয়েছিল। দয়ারাম তার টুলের ওপর বসে তখন থেকেই ঝিমোতে সুরু করল। এমনি করে কতক্ষণ কেটে গেছে, তাদের কেউ জানে না। দূরে ট্রেনের শব্দ শুনে নিখিল চোখ মেলে তাকাল। বোর্ডের যন্ত্রটিতে কতক্ষণ ধরে যে ট্রেনের খবর সমানে বেজে চলেছে, কে জানে! নিখিল চেঁচিয়ে উঠল, দয়ারাম!

দয়ারাম ধড়্ ফড়্ করে উঠে দাঁড়াল।

—দু নম্বর ক্লিয়ার দিয়ে দে!

দয়ারাম সিগন্যাল টেনে লাইন ক্লিয়ার দিল। ট্রেনটা কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে সানাই ঢোল কাঁশি ইত্যাদি প্লাটফর্মের ওপর এসে বাজছে। এটাই তো ন'টা পনেরোর গাড়ী। দয়ারাম কেবিনের জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। কজন মেয়েও এসেছে। শাঁখ বাজছে। প্লাটফর্মের এক পাশে একখানা পাল্কীও দয়ারাম দেখতে পেল।

দয়ারাম এবার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ছোটবাবু দিদিমণি ঐ পাল্কীতে করে এসেছে। ঐ তো বড়বাবু, মামাবাবু, আরও কত লোক। এবার দিদিমণি গিন্নীমা আর মামাবাবু গাড়ীতে উঠে বসলেন।

দশ মিনিট ষ্টপেজ গাড়ীটার। অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। তাই রাখালবাবুর মধ্যে বিশেষ ব্যস্ততা নেই। ধীরে সুস্থে জিনিষপত্রগুলো লোকজনকে দিয়ে ট্রেনে তুলে দিলেন। বিয়ের বাজার সদানন্দ নিজেই কলকাতায় বসে করে রেখেছেন। কাজেই নিতান্ত আবশ্যকীয় খুঁটিনাটি জিনিষপত্রই কনের সঙ্গে যাচ্ছে।

নিখিল মাথাটা একটু উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করল ষ্টেশনের দিকের ব্যাপারটা। কিন্তু পারল না। মাথার যন্ত্রণায় বালিশে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

—দিদিমণিকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

দয়ারাম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

নিখিল ভাবতে লাগল, সত্যিই কি সরমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে? এমনিতেই তো সুন্দরী দেখতে সরমাকে। তারপর আবার সাজ-গোজ একটু করলেই বেশ সুশ্রী দেখায় তাকে।

নিখিল কল্পনানেত্রে দেখতে চেষ্টা করল তার বধূবেশের রূপটি। এমনি করেই তার বরের সঙ্গে সে এসে নামবে এই নন্দনপুর ষ্টেশনেই। তখন তার সিঁথিতে থাকবে সিঁদুর, হাতে দুগ্ধশুভ্র শঙ্খবলয়, মাথায় ঘোম্‌টা আর তার সেই ডাক্তারি-পাশ-করা সুদর্শন বরটি পত্নী-ভাগ্যে গর্বিত পদক্ষেপে শ্বশুরবাড়ীর পাল্কীতে গিয়ে উঠবে বৌকে নিয়ে। নতুন বর পেয়ে সরমা অচিরেই সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাবে নিখিলকে,—নিখিলের সঙ্গে তার এতদিনের মধুর সম্পর্কের কথা। আশ্চর্য! একথা একবারও নিখিল ভেবে দেখে নি, কেন সরমা বিয়েতে মত দিল? কেন সে এ বিয়ে করতে যাচ্ছে? মা-বাবা বা মামাবাবুর ভয়ে, অথবা অপেক্ষাকৃত ভাল পাত্র পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে?

যে-জন্যেই হোক-না কেন, সরমা বিয়ে করতে যাচ্ছে, এবং তাই স্বার্থপর আদর্শহীন নারীজাতির প্রতি নিখিল মনে মনে অদম্য ঘৃণা পোষণ করতে থাকল।

আর ওই মামাবাবু। তার জীবনের ধূমকেতু ঐ লোকটি। নিখিলের

প্রবল ইচ্ছে হতে লাগল, ঐ লোকটির হৃদ্‌পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে নিতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিখিল ভাবল, ওঁরই বা এমন কি দোষ? সুন্দরী ভাগ্নীর বিয়ে কে না ভাল ঘরে-বরে দিতে চায়? উনি তা ওঁর কর্তব্যই শুধু করেছেন। নিখিল নিজের অসুস্থ দেহ-মনকে আত্ম-সান্ত্বনার প্রলেপে নিজেই শান্ত করতে চেষ্টা করল।

কেবিনে খবর এল যে, দুশো বাইশ আপ্‌ থ্রু ট্রেনটা আসছে।

নিখিল চেঁচিয়ে দয়ারামকে হুকুম দিল, তিন নম্বর অল ক্লিয়ার দিয়ে দে—

দূরে ট্রেনের শব্দ শোনা যায়। হুকুম দিয়ে আবার নিখিল চোখটি বুজে তার নিজের মনের জগতের মধ্যে আশ্রয় নিল। বিশ্বাসঘাতিনীর কি শাস্তি সে দিতে পারে? আজই—এই মুহূর্তে সে খুন করবে সরমাকে? তা করতে সে হয়তো পারে! তাকে খুব বেশী ভালবাসে বলেই তা পারে, কিংবা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু খুব বেশী দেরী হয়ে গেছে। আর সময় বা সুযোগ তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। আবার সে ভাবল, কি হবে সরমার দেহটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, সেখান থেকে তার মনটা যদি উধাও হয়ে গিয়ে থাকে? তার চেয়ে মুক্ত পাখীকে আর খাঁচায় পুরে লাভ নেই। তাকে যেতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

তবু নিখিলের মনে হল যে, প্লাটফর্মের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে-থাকা ঐ ট্রেনটা তার অতি প্রিয় জিনিষটি নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই উধাও হয়ে যাবে।

থ্রু ট্রেনটার শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠল। নিখিল চমকে উঠল দয়ারামের দিকে তাকিয়ে। সে তখনও তন্ময় হয়ে সিড়ির ওপর দাঁড়িয়ে প্লাটফর্মের দিয়ে তাকিয়ে দেখছে। খুব জোরে ধমক্‌ দিয়ে উঠল নিখিল, ওরে দয়ারাম, হাঁ করে ওদিকে দেখছিস্‌ কি? থ্রু ট্রেনটা যে এসে পড়ল? ক্লিয়ার দিয়ে দে—

—দিচ্ছি, ছোটবাবু!—

তাড়াতাড়ি বিভ্রান্তের মতো ছুটে গিয়ে ঝটপট্‌ গতিতে দয়ারাম দু নম্বরে ক্লিয়ার দিল। তারপর আবার পূর্বোক্ত জায়গায় ফিরে গিয়ে দেখতে লাগলপ্লাটফর্মের দিকে।

ওদিকে থ্রু ট্রেনটার হেড লাইট দূর থেকে ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় হতে হতে নিকটতর হয়ে এল। বালিশ থেকে মুখটা তুলে নিখিল একাগ্র চিত্তে হেড লাইটাকে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার নজর পড়ল সিগন্যালের সবুজ আলোর দিকে। তার চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল। টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে সে টানতে গেল তিন নম্বর সিগন্যাল। তার তিন নম্বরে ক্লিয়ার দেবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঝড়ের মতো গতিতে সেই বিরাট ট্রেনটা দুর্ধর্ষ দানবের মতো দু নম্বর লাইনে ঢুকে বিরাট আর্তনাদ তুলে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই সাতাশ আপ্ ট্রেণটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছ্ নছ্ করে দিয়ে নিজেও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ছিট্‌কে পড়ল চার দিকে। আর নিখিল 'গেল' 'গেল' রব তুলে মর্মভেদী চাৎকার করে পড়ে গেল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা দয়ারাম পাগলের মতো ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ছোটবাবু, ছোটবাবু'। নিখিলের জ্ঞানহীন দেহটা ততক্ষণে কেবিন-ব্রিজের ওপর গড়াতে গড়াতে নীচের পড়ে গেছে। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে দয়ারাম নিজের চোখ-মুখ দুহাতে চেপে ধরল। ষ্টেশনটার দিকে সে আর তাকাতে পাচ্ছে না। অসংখ্য ভাঙা বগি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কত প্রাণ যে নষ্ট হয়েছে, পংগু হয়েছে, তার ঠিক নেই। কোথাও বা বগি উল্টে গিয়ে চাকাগুলো উর্ধ্বমুখী হয়ে তখনও হয়তো ঘুরছে। আবার কোথাও-বা প্লাটফর্ম ভেঙে দু-একটা বগি প্লাটফর্মের ওপর উঠে গেছে বেশ খানিকটা। সে-সব বীভৎস দৃশ্য তাকিয়ে দেখা যায় না। যাত্রীদের বিপদ্‌কালীন ভীতিগ্রস্ত চেঁচামেচি তখনও থামে নি। ষ্টেশন-ষ্টাফ, রেল-পুলিশের কর্মচারীরা—সবাই ছুটোছুটি করতে লাগল। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হতে লাগল। হতদের আলাদা করে জড়ো করা হল ষ্টেশনেরই একটা বড় হল ঘরে পুলিশের হেফাজতে।

ক্রমশঃ গোলমাল নিস্তেজ হয়ে এল। সরমার অজ্ঞান দেহটা ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পাঠানো হলে রাখালবাবু ষ্টেশনে ফিরে গিয়ে চারদিকে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। সদানন্দ ও মনোরমার কোন

ক্ষতি হয় নি। তাঁরা সরমার কাছে হাসপাতালে খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। সরমার একটা পায়ে খুব জোর চোট লেগেছে।

রেলওয়ে হেড অফিস থেকে খবর এল যে স্পেশাল ট্রেনে ওপরওয়ালা অফিসারেরা যথাশীঘ্র এসে পৌঁছবেন।

দয়ারাম আর দুজন কুলির সহায়তায় নিখিলের অসুস্থ জ্ঞানহীন দেহটা টেনে তুলে তার কোয়ার্টারে নিয়ে গেল। নিখিলের বিছানার পাশে বসে দয়ারাম সারা রাত ধরে ভয়ে কাঁপল, এবং থেকে থেকে কেঁদে উঠল।

অনেক রাত্তিরে রাখালবাবু একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে কেবিন ভিজিট করতে এসে দেখেন যে, সেখানে কেউ নেই। তিনি ভাল করে বোর্ডটা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ভুল লাইন ক্লিয়ারের জন্যেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। নিজের ডায়েরীতে তিনি তাঁর পরীক্ষাপ্রসূত খুঁটিনাটি তথ্যগুলো লিখে নিলেন। একজন এ, এস, এম, এবং দুজন পোর্টার এবং পুলিশের তরফ থেকে একজন কর্মচারীকে তিনি বাকি রাতটুকু কেবিন পাহারায় নিযুক্ত করলেন। কেবিনের কোন কিছুতেই তারা হাত দেবে না, যে-জিনিষ যেমন অবস্থায় আছে, ঠিক তেমন অবস্থাতেই থাকবে, এই রকম নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। কেবিনটা হেড অফিসের সাহেবরা এসে পরীক্ষা করবেন। তাই পাহারার ব্যবস্থা হল।

সারা রাত স্টেশনে বসে রাখালবাবু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। মেয়েটা কেমন আছে, কে জানে! তিনি লক্ষ্মণ সিং-কে ডেকে একবার হাসপাতালে পাঠালেন সরমার খবরটা আনবার জন্যে।

রাত পোহাল। ভোর রাত্তিরেই নিখিলের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। দুর্ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে উৎকণ্ঠায় তার মুহূর্তগুলো কাটছে। ভোরের আলোয় ভরে গেছে বাইরের আকাশ। বিছানায় শুয়ে রইল সে। ওঠবার শক্তি তার নেই। নিজের দেহ-মনকে অতি দুর্বল বোধ হতে লাগল। সারা গায়ে খুব ব্যথা। দয়ারামের পায়ের শব্দে সে চমকে উঠল। দয়ারাম ঘরে ঢুকল।

—কে ?

—আমি দয়ারাম, ছোটবাবু! হেড অফিস থেকে অনেক সাহেব এসেছেন তদন্ত করতে।

—অ্যাঁ?

নিখিলের চিন্তামগ্ন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দয়ারাম অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, আমার দোষে এস্‌সিডেণ্ট হল, ছোটবাবু, আমার জেল হয়ে যাবে। আমার বৌ-ছেলের কি হবে, ছোটবাবু? না খেয়ে মরে যাবে তারা। কি হবে, ছোটবাবু?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল দয়ারাম। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিখিল যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, তুই কিছু ভাবিস্ নে, দয়ারাম। তোর কোন শাস্তি হবে না। সব দোষ আমার, সব দায়িত্ব আমার। তুই পালিয়ে যা—

—অনেক দয়া আপনার, ছোটবাবু! ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

—ভগবান আমার মঙ্গল করবেন?

হাসল নিখিল। নিজের ভাগ্যের কথা স্মরণ করে সে আবারও হাসল।

—ঐ তো, সাহেবরা এদিকেই আসছেন।

—তুই পালিয়ে যা এখান থেকে। আর দেরী করিস্ নে—

—না, ছোটবাবু, না! আপনাকে এমন বিপদে ফেলে কিছুতেই আমি যাব না। আমি ধরা দেব।

—আমাকে বেশী কথা বলাস্ নে, দয়ারাম। আমি সত্যিই খুব অসুস্থ।

—কিন্তু আপনার যে জেল হবে, ছোটবাবু!

—হোক্! আমার জেল হলে এত বড় পৃথিবীর কোথাও কারও এতটুকু ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোর? তোর বৌ আছে, ছেলে আছে, তাদের দেখবে কে? পালিয়ে যা—শীঘ্‌গির যা—

দয়ারাম ভয়ে আতঙ্কে বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষন সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

তদন্ত কমিটির অফিসারেরা, রাখালবাবু, একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর এবং দুজন পুলিশ কনেষ্টবল এসে নিখিলের ঘরে ঢুকলেন। নিখিল

বালিশে-রাখা মাথাটা সেদিকে ঘোরাল। তাঁরা নিখিলের পাশে এবং চেয়ারে ভাগাভাগি করে নিজেরাই বসলেন।

জনৈক অফিসার বললেন, নিখিলবাবু, গত রাত্তিরের এক্সিডেন্টের একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট লিখে দিতে হবে।

—দেখুন, আমি বড্ড অসুস্থ। উঠে বসে লিখবার সামর্থ্য আমার নেই। আমার একটিমাত্র কথা আছে। আপনারা তা লিখে নিন, আমি সই করে দিচ্ছি সেই লেখার তলায়। কথা হল এই যে, এক্সিডেন্টের সব দোষ আমি স্বীকার করি।

রাখালবাবু নিখিলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, না না নিখিল, এ তুমি কি করছ? না না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়। তোমার মতো ছেলে কিছুতেই এমন কাজ করতে পারে না।

—বড়বাবু, এ দুর্ঘটনার জন্যে আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

একজন অফিসার চট্ করে একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট লিখে ইন্‌চার্জের হাতে দিলেন। তিনি কাগজখানা হাতে নিয়ে বললেন, রাখালবাবু, আসামী তাঁর দোষ স্বীকার করেছেন। এর পরে আর কোন কথা চলে না। আসুন, নিখিলবাবু, এই আপনার জবানবন্দী, এর তলায় একটা দস্তখৎ করে দিন।

নিখিল শায়িতাবস্থায় মাথা একটু উঁচু করে অফিসারটির হাত থেকে কলমটা নিয়ে জবানবন্দীর তলায় দস্তখৎ করে দিল। জবানবন্দীটা একবার পড়বার ইচ্ছেও তার হল না।

অফিসারটি নিখিলের হাত থেকে কলমটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনার জবানবন্দী আমি গ্রহণ করলাম। আপনাকে গ্রেপ্তার করছি, নিখিলবাবু!

—বেশ!

শান্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে নিখিল জবাব দিল।

রাখালবাবু বললেন, এ তুমি পাগলের মতো কি করলে, নিখিল?

খুব ম্লানভাবে সামান্য হেসে নিখিল বলল, ঠিকই করেছি, বড়বাবু। আমার এ তুচ্ছ জীবনটার কি এমন দাম আছে যে, তাকে বাঁচাবার জন্যে—

—ও:!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাখালবাবু রেলওয়ে অফিসারদের পেছন পেছন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে নিখিল বলল, বড়বাবু, সরমার কিছু হয় নি তো ?

পেছনে না ফিরে, নিখিলের দিকে না তাকিয়ে, রাখালবাবু বললেন, সরমা ? সরমার কথা বলছো ?

হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন রাখালবাবু আর কোন কথা না বলে। তাঁর অমন অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে যাওয়াটা নিখিলের ভাল লাগল না। মনে মনে নিজেকে সে বরং অপমানিতই বোধ করল। অপরাধী সে। তার সব কথার সব জবাব আশা করাও যেন তার পক্ষে আরও বেশী অপরাধ। নিখিলের চোখ দুটো আপনা থেকে বুজে এল।

নিখিলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বিচারে আসামীর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। আসামী এক্‌সিডেন্টের সময় অসুস্থ ছিল বলে শাস্তি কম হল। আর বিচার সহজেই মিটে গেল, আসামী অকপটে স্বীয় দোষ স্বীকার করায়।

জেলের জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে নিখিল আদৌ মাথা ঘামায় না। সে উদাস হয়ে বসে বসে প্রায়ই ভাবে তার আশৈশব জীবনের কথা। মাকে হারিয়েছে ছ' বছর বয়সে। বাবাকে আরও আগে। বাবার মুখ মনে পড়ে না ভাল করে। তারপর জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে তার জীবন কাটল।

সেই অতি সাধারণ জীবনের মধ্যে স্নেহ-মায়া-ভালবাসার স্বাদ সে কোনদিন পায় নি, আশাও করে নি। তাই নন্দনপুরে এসে মোহন ও স্বর্ণকে নিজের ভাই-বোনের মতোই আপন করে নিতে পেরেছিল অতি সহজেই। রাখালবাবুর স্নেহ হৃদয়ঙ্গম করে কৃতার্থবোধ করেছিল, দয়ারামের শ্রদ্ধাকে মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করে নি। আর সরমার প্রেমকে বিশ্বাস করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে নি, বরং নিজের সবটুকু মন-প্রাণ ঢেলে সে প্রেমের আরতি করছিল সরমাকে। তবু সরমা কেন তাকে প্রতারণা করল ? কেন সে তাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে গিয়েছিল ? কেন সে তবে নিখিলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল ? কে

কি শুধুই নিছক মোহের বশে, না তার মধ্যে প্রকৃত প্রেম বলে কোন বস্তু ছিল?

নিখিল কিছুতেই ভেবে কূল-কিনারা পায় না সরমার চরিত্রের সঙ্গতি খুঁজে। তবু নিখিল সেদিনও সরমাকে যতখানি ভালবাসত, আজও ততখানি ভালবাসে। সে জানে না, সরমা আজ জীবিত আছে কি না। যদি সে জীবিত থাকে, তাহলে জেল থেকে বেরিয়ে সর্বপ্রথম নিখিল ছুটে যাবে তারই কাছে। সে জানে যে, এই ট্রেন-দুর্ঘটনার জন্তে সারা নন্দনপুরের লোকেরা তাকেই অপরাধী বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু সে জানে যে, অন্তত: একটি মানুষ আজও নিশ্চয়ই তাকে এইটুকু বিশ্বাস করে যে, সে এমন নীচ কাজ স্বেচ্ছায় করতে পারে না। সে-মানুষটি সরমা ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু সরমাও যদি এতদিনে বিশ্বাস করে থাকে যে, নিখিল ইচ্ছে করে তাকে খুন করতে গিয়েছিল, তাদের বিয়ের সম্ভাবনা নেই দেখে? না না, তা হতে পারে না! তা তো সত্যি নয়। যা সত্যি নয়, তা সরমা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে সরমার কাছে ছুটে গিয়ে সব কথা খুলে বলে ভারমুক্ত হবে। মিথ্যে অপরাধের বোঝাটা সে আর বয়ে বেড়াতে পারে না।

নিখিলের জীবন জেলখানার ভেতরে একটানা কাটে। কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন স্বাদও নেই সেই অভিশপ্ত জীবনে। এমন জীবন যে কখনও তাকে যাপন করতে হবে, তা ছিল তার স্বপ্নেরও বাইরে। তবু নিয়তির পরিহাসের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হল। প্রতিদিন সে দিন গোনে, কবে তার এই মৃত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে পুনর্জীবন লাভ করে সে নন্দনপুরে ফিরে যাবে। নন্দনপুরের একমাত্র আকর্ষণ সরমার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। সরমার স্বপ্নে তার দিন কাটে। সরমা তার রক্ত-মাংসের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে। তাই সরমা তার কাছ থেকে দূরে সরে অন্তের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবে, তা হয়তো ভগবান চান নি। মানুষের আপ্রাণ চেষ্টাকে তাই তিনি কঠিন হাতেই ব্যর্থ করে দিলেন। তবু—তবু জেল থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে বেরিয়ে যদি সে দেখতে পায় যে, সরমার বিয়ে হয়ে গেছে? না না, সে-কথা নিখিল ভাবতেও পারে না। ভাবতে গেলে, তার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে ওঠে।

॥ আট ॥

এই কাহিনীটি নিখিল সংক্ষেপে বিবৃত করল তার বন্ধু প্রকাশ এবং বন্ধুপত্নী বিনতার কাছে। বলা শেষ করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবারও কথা বলল, জানতাম না, প্রকাশ যে, জেল থেকে বেরিয়ে সরমাকে অমন অবস্থায় দেখতে হবে। তার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। তার ঐ দুরবস্থার জন্যে দায়ী সত্যিই কি আমি? আমি তো নিশ্চিতভাবেই জানি যে, আমি দায়ী নই, তবু নিজেকেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আমায় চিনতে পেরে পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল। আমায় আজ সে ঘৃণা করে। তাই পথের কুকুরের মতো আমায় সে তাড়িয়ে দিল। আমি তার কাছে আর কিছুই আশা করি নে প্রকাশ, শুধু সে একটিবার বলুক যে, সে আমায় বিশ্বাস করে, সে স্বীকার করুক যে, আমি অমন নীচ কাজ করতে পারি না, তা সে জানে! তাহলেই আমি তাকে আর কোনদিন বিরক্ত করব না। আমি তার থেকে অনেক দূরে চলে যাব। কিন্তু তার ভুল আমাকে ভাঙতেই হবে, প্রকাশ!

কঠিন রুক্ষ দৃষ্টিতে নিখিল তাকিয়ে রইল প্রকাশের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। ঘড়িটা সমানে টিক্-টিক্ করে চলেছে। নিখিলও কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছে। তার বুকের ভেতরের হৃদ্‌পিণ্ডটাও ওই ঘড়িটার মতো ধ্বক্-ধ্বক্ করে উঠা-নামা করছে।

কিছুক্ষণ পরে তার দৃষ্টিটা শান্ত ও মোলায়েম হয়ে এল। সে প্রকাশের দিকে একটুখানি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, শুন্‌লি তো সব, বলতে পারিস্ প্রকাশ, তবু কেন সরমা আমায় ঘৃণা করে?

— না না, ঘৃণা করবে কেন?

— তুই জানিস্ নে প্রকাশ, কি সাংঘাতিক রকমের ঘৃণা সে আমায় করে। তার ধারণা, আমি নাকি ইচ্ছে করে—

— তা ঠাকুরপো, কিছু মনে করবেন না ভাই, আমরা যতটুকু শুনেছি তাতে তো মনে হয় যে সরমাকে আপনি চিরদিনের মতো হারাচ্ছেন ভেবে, জ্ঞানহারা হয়ে স্বেচ্ছায় এক্‌সিডেণ্টটা ঘটালেন। তবে—

— কি বললেন? কি বললেন আপনি? আপনিও সেই একই কথা বলছেন?

নিখিলের কর্কশ উচ্চ কণ্ঠ শুনে চম্‌কে উঠল বিনতা, ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রকাশ। রাগে অপমানে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে নিখিল। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। ক্রোধারক্ত দৃষ্টিটা উন্মাদের মতো একবার বন্ধু-দম্পত্তির প্রতি বুলিয়ে নিয়ে আর কোন কথা না বলে হন্‌হন্‌ করে সে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে প্রকাশ ডাকল, নিখিল,—নিখিল শোন, দাঁড়া—

কে কার কথা শোনে! নিখিল মুহূর্তের মধ্যে পথে নেমে উধাও হয়ে গেছে কোথায়, প্রকাশ সদর দরজার কাছে এসে তার আর হদিস্ পেল না। প্রকাশ ফিরে গিয়ে বিনতাকে মৃদু ভৎসনা করল, কেন তুমি ও কথা বলতে গেলে? দেখছ, পাঁচ বছর জেল খেটে ওর মাথাটা একটু কেমন-কেমন যেন হয়ে গেছে!

— আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে, ও কথায় উনি অমন করে চটে উঠবেন, আর অত উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে যাবেন। তাহলে আমি বলতাম না।

— বেরিয়ে তো গেল। এখন থাকবে কোথায়, কে জানে! আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই ওর। ভারি দুঃখী। ভেবেছিলাম, আমাদের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছে, তখন দু-একদিন এখানে থেকে একটু সুস্থ হয়ে যেত।

— আমার মনটাও বড্ড খারাপ হয়ে গেল। আমার অপরাধ হয়েছে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!

— যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর অনুতাপ করে লাভ নেই।

— ওঁকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না? কাল সকালে যদি একটু চেষ্টা কর—

— এত বড় কলকাতা শহরে কোথায় তাকে খুঁজে পাবে? সে কি

কাছাকাছি কোথাও বসে থাকবে নাকি? তুমি তো জান না, কি নিদারুণ অভিমানী ছেলে সে। তার দেখা পেলেও তাকে ফিরিয়ে আনার সাধ্য আমার কেন—কারো নেই।

কলকাতার জনতার মধ্যে নিজেকে নিখিল হারিয়ে ফেলল। কিন্তু তাতেও সে শান্তি পেল না। প্রায় অভুক্তাবস্থায় পথে পথে দু-একদিন বেড়ানোর পর তার খুব আকস্মিকভাবেই মনে পড়ে গেল মোহনের কথা। জেল থেকে বেরিয়ে সর্বপ্রথম তার মোহনের কাছেই যাওয়া উচিত ছিল। মোহন তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মোহনের কাছে গিয়ে দু-চার দিন থেকে মনটাকে একটু সুস্থ করে নিয়ে তারপরের কথা পরে ভাবলেও চলবে।

সে দেরাদুন রওনা হল।

ষ্টেশনে নেমেই খোঁজ করে সে অতি সহজে মোহনের কোয়ার্টার চিনে বের করল। দরজায় কড়া নাড়তেই মোহন এসে কপাট খুলে দিল। নিখিল তার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে হেসে বলল, জানি, এ চেহারায় চিনতে পারবি নে!

—ওঃ, তুই নিখিল! তাই ব । ভেতরে আয়!

মোহনের পেছন পেছন নিখিল মোহনের বসবার ঘরটায় একটা চেয়ারে বসল। তারপর খুব স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, কেমন আছিস্ ভাই?

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে মোহন জবাব দিল, ভালই আছি!

ইতিমধ্যে মোহনের স্ত্রী ইলা এসে সেই ঘরে ঢুকল। ইলার চালন-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, সে একটুখানি অহংকারী ও আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির মেয়ে! তার সৌখিন জামা-কাপড়ের জৌলুসে ও কপট গাম্ভীর্যের মুখোস অনুভব করে নিখিল নিজের সারল্যময় স্বাভাবিক ভাবটা অনেকখানি হারিয়ে ফেলল কয়েক কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তা'ছাড়া, তার মনে হল যে, মোহনও যেন ঠিক আগের মতো আর সহজ বন্ধুত্বকে পুরোপুরি মেনে নিতে চাইছে না। ইলার কোলে সুশ্রী বাচ্চাটাকে দেখে খুসী হয়ে মুখে হাসি টেনে এনে সে বলল, বিয়ে করলি কবে যে এমন সুন্দর বাচ্চা হল?

—এই তো বছর তিনেক হল। তোকে ভাই, জানাতে পারিনি। তুই তখন জেলে।

ইলার কোলে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এতক্ষণ নিখিল কথা বলছিল। এবার সে বাচ্চাটার কথা আবার জিজ্ঞেস করল, বাচ্চার বয়স কত হল ?

—বছর খানেক।

—কি নাম রেখেছিস্ ?

—নামকরণ এখনও হয় নি।

—বেশ লাগছে তোদের দেখে। বৌমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে তো দিলি নে ?

—ওঃ, হ্যাঁ, তোমাকে নন্দনপুরের যে নিখিলের কথা বলতাম এতদিন, এই সেই নিখিল !

—ওঃ ! আপনার কথা ওঁর মুখে অনেক শুনেছি !

তবু ভাল যে মোহনের বৌ তার মতো একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলল। তার ভারি লজ্জা হচ্ছিল নিজের চেহারা ও সাজ-পোষাকের কথা ভেবে। বন্ধুর পরিচয় মেনে নিয়ে তাকে মোহন যেন অনেকখানি কৃতজ্ঞ করে ফেলেছে।

মোহনের বাচ্চাটাকে একটু আদর করবার লোভ সে কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিল না। তার গালটা মৃদু টিপে দিয়ে ইলার কোল থেকে তাকে নিতেই বাচ্চাটা তার গোঁফ-দাড়িসুদ্ধ কিম্ভুত কদাকার মুখখানার দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে কর্কশ স্বরে কেঁদে উঠল। চোখ-মুখ কুঁচ্কে বিরক্তিভরে এক টানে নিখিলের কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে হন্ হন্ করে ইলা বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

নিখিল ভাবল, বাচ্চাটা তার চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে হয়তো। তার আবার সেজন্যে কোন অসুখ-টসুখ না হয়।

তবু ইলার নিরব রূঢ় ব্যবহার তার ভাল লাগল না। কারো কাছ থেকেই এ জাতীয় ব্যবহার পেতে সে কখনও অভ্যস্ত ছিল না।

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোহন বলল, জেল থেকে সদ্যঃ ছাড়া পেয়েছিস্, মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, এই তো সবে কদিন হল—

—তোর সঙ্গে জেলে গিয়ে দেখা করতে পারিনি বলে মনে কিছু করিস্ নে, ভাই অফিসের কাজের যা চাপ পড়েছিল ? উঃ !

—তাতে কি হয়েছে ? ওসব আমি কিছু মনে করি নে। তুই সুস্থ আছিস, সুখে আছিস্, এইটুকু দেখেই আমার আনন্দ, মোহন। তোকে চিরদিনই তো এক মায়ের পেটের ভাইয়ের মতোই দেখে এসেছি ! মনে পড়ছে তোকে দেখে আজ স্বর্ণের কথা। স্বর্ণ বেঁচে থাকলে তারও এতদিন বিয়ে-থা হত, সে-ও এতদিন তোর মতো সংসার-ধর্ম করত।

—স্বর্ণের কথা তোর এখনও মনে আছে ?

—থাকবে না ? সে-সব দিনগুলোকে কি ভোলা যায় ?

—আমি তো একেবারে চাকরি-চাকরি করে নিজেকেই ভুলতে বসেছি। উঃ, আজকাল কি যে কাজের চাপ বেড়েছে ? আগের মতো বাঁধা-ধরা জীবন আর নেই। বুঝ্লি নিখিল ?

—সত্যি বুঝি ?

উদাস হয়ে নিখিল ভাবতে লাগল যে, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কতখানি বদলে যেতে পারে। এত আদরের বোন স্বর্ণকে মোহন ভুলে গেছে। কর্মচ্যুত বেকার বন্ধুর কাছে বারবার অফিসের গল্প করে তার পূর্বজীবনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জেলখানার যে জীবনের কথা নিখিল প্রতিনিয়ত ভোলাবার চেষ্টা করছে, সেই জেলখানার কথা প্রতিটি প্রসঙ্গের সঙ্গে উল্লেখ করে মোহন মনে মনে হয়তো অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করছে।

—এবার জামা-কাপড় ছেড়ে স্নানাদি করে কিছু খেয়ে নে !

নিখিলের জন্যে মোহন বাড়ীর ভেতর থেকে তার নিজের এক প্রস্থ কাপড়-জামা এনে দিল।

মোহনের এই সুব্যবহারে নিখিল আবার খুসী হয়ে উঠল। ছিঃ, মোহনের সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরে কি সব আবোল-তাবোল সে ভাবছিল ? নিজেকেই বারবার ধিক্কার দিতে দিতে সে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রাত্রিরে শুয়ে নিখিলের চোখের পাতায় ঘুম নেই। স্বর্ণের কথা

এতদিন পরে খুব বেশী করে মনে পড়েছে। আজ তার এমন দুর্দিনে স্বর্ণ নিশ্চয়ই তাকে দূরে ঠেলে দিতে পারত না। নানা কথা ভাবতে ভাবতে অনেক রাত হয়ে গেল।

পাশের ঘরে শুয়েছিল মোহন এবং ইলা। তাদের কিছু কিছু কথা তার কানে ভেসে আসছিল। ইলা তার স্বামীকে বলল, সে-মেয়েটা নাকি খোঁড়া হয়েছে?

—কে, সরমা?

—হ্যাঁ! তুমি আবার ঐ খুনেটাকে ঘরে পুষে রাখলে?

—চুপ কর, শুনতে পাবে যে!

—শুনল তো একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। বেশ হয়েছে! জেলখানায় পাঁচটি বছর ঘানি টানিয়ে তবে ছেড়েছে। দেখছ না চেহারার হাল?

—আমারও মনে হয়, ও ইচ্ছে করেই এক্সিডেণ্টটা ঘটিয়েছে। তুমি তো জান না, সরমাকে ও কি সাংঘাতিক রকম ভালবাসত!

—আবার স্বর্ণের জন্যে শোক উথ্‌লে উঠল। বলে, স্বর্ণ বেঁচে থাকলে, তার বিয়ে হত, সে ঘর-সংসার করত—

—না বাবা, স্বর্ণ মরে আমায় বাঁচিয়েছে। আমার এই সামান্য আয়ে তোমার আর খোকনের মুখে ভালভাবে দুটো খাবার তুলে দিতে পাচ্ছিনে তো আবার বোনের বিয়ে কোত্থেকে দিতাম? ভগবান যা করেন, মানুষের মঙ্গলের জন্যেই তা করেন।

মোহন পাশ ফিরে শুলো। ইলা তার হাতখানা সোহাগভরে স্বামীর পিঠের ওপর রাখল।

নিখিল ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসল। মোহনের পরিবর্তনে সে বিস্মিত হল। ইলার মনোবৃত্তির পরিচয়ে সে ক্ষুণ্ণ হল। একবার তার প্রবল ইচ্ছে হল চীৎকার করে উঠে প্রতিবাদ করে তাদের কথার, মোহনকে সেই পুরনো দিনের মতো শাসন করে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের হাতে কণ্ঠ টিপে ধরে সংযত করল নিজেকে। তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল মোহনের বাড়ী থেকে সেই গভীর রাত্তিরে।

॥ নয় ॥

সরমার দিনগুলো একটানা কাটে। সংসারের কোন কাজই সে করতে পারে না। ব্যর্থ জীবনের ভার তার আর সহ্য হয় না। প্রৌঢ় মা-বাবার ওপর পরোক্ষভাবে সে অত্যাচারই করছে। মামাবাবু আজকাল আর তাদের খোঁজখবরও নেন না। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। তাঁদের নিয়েই তিনি ব্যস্ত। সরমার পা কাটা যাওয়ার পর সেই ডাক্তার পাত্রটির বাবা বিয়েটা নাকোচ করে দেন। স্বভাব-চরিত্র নিয়েও কিছু কিছু কথা তাঁদের কানে গিয়ে পৌঁছেচে। সদানন্দ-বাবু তাই আর সেখানে জোর খাটাতে পারেন নি। তবে তিনি রাখালবাবুকে আশা দিয়েছিলেন যে, স্বয়ং পাত্রকে তিনি নিজে একবার অনুরোধ করে দেখবেন। পাত্র একজন শিক্ষিত যুবক। তাই সে বিয়ে করতে রাজী হোক বা না-হোক র কথাগুলো অন্ততঃপক্ষে ধৈর্য-সহকারে সে শুনবে, এটুকু আশা মনে মনে তিনি পোষণ করেন।

শেষ পর্যন্ত একথা সত্যি হয়েছিল যে, পাত্র ধৈর্যসহকারে শুনেছিল সদানন্দবাবুর অনুরোধ। কিন্তু তার বাবা তার আগেই অন্যত্র তার বিয়ের ব্যবস্থা করায় সে কিছুই করতে পারে নি। একটা মেয়ের জীবন দৈব-দুর্বিপাকে এমন করে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে তার মনে সরমার প্রতি অনেকখানি সহানুভূতিও ছিল। এ সব কথাই সদানন্দবাবু রাখালবাবুকে পত্রে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে-ও তো প্রায় বছর তিনেক আগেকার কথা। সে-সব আব্‌ছা আব্‌ছা সরমার মনে পড়ে।

সেই থেকে সরমার একঘেয়ে জীবনের স্রোত একই ভাবে বয়ে চলেছে। কিছু সেলাই, কিছু বই-পড়া, এবং কখনও ঘরে, কখনও-বা বারান্দায় সন্তর্পণে চলাফেরার মধ্যে তার সময় 'কাটে না কাটে না' করেও কোন রকমে কেটে যায়। তবু তার মনে হয় যেন পৃথিবীর সকলের চোখেই সে একটি অপদার্থ বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। সে জানে যে, অপরের করুণার ওপর নির্ভর করেই তাকে চিরকাল বেঁচে থাকতে হবে। আজ

তার মা-বাবা বেঁচে রয়েছেন। কিন্তু এমন দিনও তার জীবনে আসবে, যখন তাঁরা কেউই বেঁচে থাকবেন না, তখন কে দেখবে সরমার ভাল-মন্দ, কে তুলে নেবে তার জীবনের ভারি বোঝাটা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে? কে? আপন মনে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে কত দিন সে কেঁদে কেঁদে যে সারা হয়েছে, তার ঠিক নেই।

মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতে রাখালবাবুর চেহারাটাও দিন দিন ভেঙে পড়ছে। যদি তিনি মেয়েটার কোথাও বিয়ে দিতে পারতেন তাহলে অন্তত: নিশ্চিন্ত মনে মরতেও পারতেন। এই দুর্ভাবনা তাঁর এত দিনের সুখের সংসারের সবটুকু শান্তি তিলে তিলে নষ্ট করে দিয়েছে। সরমারও মনে হয়েছে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করবার কথা। কিন্তু মা-বাবা আরও দুঃখ পাবেন তাতে, সেই কথা ভেবে সে তা করতে পারে নি। নইলে এ বোঝার অবসান সে সহজেই ঘটাতে পারে।

নিখিলের আকস্মিক আবির্ভাব সরমার নির্জীব জীবনে নতুন করে স্মৃতির ঢেউ তুলল। পাঁচ বছর আগেকার স্বাভাবিক জীবনধারার মধ্যে সে ফিরে গেল। আজ কদিন নিরন্তরভাবে তার সেই সব দিনগুলোর কথা ভেবেই কেটেছে। কত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশাময় ছোট ছোট ঘটনার স্মৃতি তার মনটাকে টেনে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে সে তন্ময় হয়ে থাকে।

নিখিলের প্রতি সে অবিচার করেছিল, তাকে সে প্রতারণা করতে চেয়েছিল সামান্য লোভে, কিছুটা আত্মাভিমানে, আর কিছুটা-বা পরস্পরের ভুল বোঝা-বুঝির জন্যে। সে মনে মনে নিজের অন্যায় স্বীকার করে নিখিলকে তার জীবন থেকে হারানোর জন্যে অনুতাপ করে। কিন্তু তাই বলে নিখিল তাকে হত্যা করবার অমন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে কেন? ছিঃ ছিঃ, তাই বলে অমন করে সে একটা সাধারণ খুনী হয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত? কত লোক মরল, কত লোক যে আহত হল, পংগু হল,—সে-সব ভাবতে গেলেও সরমার সারা শরীর এখনও শিউরে ওঠে তাছাড়া, সেই দুর্ঘটনার কেলেঙ্কারি খুব পাকাপাকিভাবে সারা নন্দনপুরে প্রমাণ করে দিয়েছে সরমার চরিত্রের কলঙ্কটুকু। নিখিলকে সে কোন-দিনও ক্ষমা করতে পারবে না। তার দুঃস্বপ্ন সে ধীরে ধীরে মন থেকে দূর

করে দিতে চায়। কিন্তু পারে কি তাই? পারে না। দুষ্ট গ্রহের মতো আষ্টেপিষ্টে নিখিলের ভাবনাই ইদানীং তাকে সারাক্ষণ গ্রাস করে থাকে। সে মুক্তি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয় সেই রাহুগ্রাস থেকে, কিন্তু বৃথাই। সেই অন্ধকার চৌকাঠের গায়ে মাথা কুটে কুটে তার দিন কাটে। নিখিলকে ভোলা খুব সহজ নয়। নিখিলকে সে মেয়েমানুষের মন নিয়েই একদিন ভালবেসেছিল, তাই হয়তো সে ভুল করেছিল; অথবা এখন তাকে এড়াতে গিয়ে ভুল করছে, তা সরমার অনুভূতির বাইরে। সরমা এত গভীরভাবে এসব কথা আর ভাবতে পারে না। তার চোখের সামনেকার সবকিছু যেন মৃত স্বপ্নের কবরের মতোই মিথ্যে কুয়াসা আর শূন্য অন্ধকারে ঢাকা।

তবু—তবু সেই অপরিসীম অন্ধকারের কাছে কাছে থাকে বুঝি আবছা আলোর মিনার, শাদা চোখে সব সময় যাকে ঠাহর করা যায় না। গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে কখনও কখনও তবু খুব কাছেও সে যেন ঠিকরে এসে পড়ে দিশেহারা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যেই দিয়ে যায় সঞ্জীবনী মন্ত্রসুধার স্পর্শ।

সরমার এই নিদারুণ জটিল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নন্দনপুরে এসে পৌছল অশোক। রাখালবাবুর কোয়ার্টারের সামনেকার বাগানটির পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল রাখালবাবুর নাম ধরে।

সরমা ঘরের ভেতর বসে উলের মাফ্‌লার বুনছিল তার বাবার জন্যে। বাইরে মানুষের গলা শুনে কাঠের পায়ে ভর করে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দেখল যে, দামী সুট পরা সুদর্শন একটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কোয়ার্টারের সামনে। যুবকটি সরমার দিকে চোখ পড়তেই যেন চম্‌কে উঠল। তার [illegible] পায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, রাখালবাবু?

—আমার বাবা।

—বাড়ীতে আছেন?

—আছেন। আপনি এই ঘরে এসে বসুন!

যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে ঘরে গিয়ে বসল। সরমা বাড়ীর ভেতরে গিয়ে রাখালবাবুকে বলল, বাবা, কে একজন লোক তোমায় ডাকছেন। বাইরের ঘরে বসে রয়েছেন।

রাখালবাবু বাইরের ঘরে এসে অশোককে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। অশোক উঠে এসে বিনীতভাবে তাঁকে প্রণাম করে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। তারপর সে অনর্গল কথা বলতে সুরু করল।

—সদানন্দবাবুর মুখে আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছিলাম। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবার অমতে তা করতে পারলাম না। বাবা সেই বছরেই আমার অন্যত্র বিয়ে দিলেন। আমার স্ত্রী বছর না-ঘুরতেই মারা গেলেন। বাবাও গত বছর মারা গেলেন। সংসারে আমি এখন একা। সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করছি, কিন্তু কত দিন আমার মনে হয়েছে যে, আপনাদের প্রতি যে অন্যায় আমরা করেছি, সেজন্যে আপনাদের কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাই আজ একেবারে মন স্থির করে বেরিয়ে পড়েছি। আমাকে ক্ষমা করে আমায় নিষ্কৃতি দিন, এই আমার প্রার্থনা।

খুব শান্তভাবে হেসে রাখালবাবু বললেন, দাদার মুখে শুনেছিলাম যে, তুমি খুব ভাল ছেলে, তবে তুমি যে এতখানি ভাল, তা আমি জানতাম না, বাবা! নিষ্কৃতি তোমায় আমি দেবার কে? আর তোমার বাবার অন্যায়ের জন্যে তুমিই বা ক্ষমা চাইবে কেন? অন্যায় তো তুমি কিছু কর নি? অন্যায় তোমার বাবাও যে করেছেন, তাও বলি নে। সবই আমার কপাল, বাবা!

—তবু তিনি আমারই বাবা। তাঁর যে-কোন কাজের জন্যে আমিই দায়ী। আমাকে সেই দায়মুক্ত করুন।

অশোকের কণ্ঠ থেকে বিনয়সিক্ত অপরাধের ধারা ঝরে পড়ছে। রাখালবাবু তার মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় প্র্যাকটিস্ করছ?

—কলকাতাতেই।

—তুমি তো বললে যে, একলা মানুষ। তা, বিয়ে করছ না কেন?

—সে-ইচ্ছে আর নেই!

কথা বলে অশোক যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনে পড়ল তার সরমার মুখখানা। ইচ্ছে করলে, এই প্রতিমার মতো স্ত্রী-রত্ন তার হতে পারত। প্রথম দেখাতেই সে বিচার করে নিয়েছে সরমার রূপ-সৌন্দর্য। পা-খানা যে তার কাটা, তা-ও তো দুর্গ্রহের জন্যে। নইলে

বিয়ে তো তাদের হয়েই যেত! যদি তাদের বিয়ের পর ট্রেন-দুর্ঘটনায় সরমার পা-খানা কাটত তাহলে কি অশোক নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কোথাও বিয়ে করত? নিশ্চয়ই করত না!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নানা কথা ভেবে অশোক নিজেদের তরফের অপরাধের কথা ভেবে আরও কাতর হয়ে পড়ল।

রাখালবাবুও এতক্ষণ কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, এসেছ যখন এত দূরে কষ্ট করে, তখন দুটি না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবে না, বাবা!

—না, তার আর দরকার নেই। এখুনি একটা প্ ট্রেণ আছে। খুব তাড়াতাড়িই কলকাতায় পৌছে যাব।

—তোমার কোন আপত্তিই আজ আজ শুনব না। মনে থাকে যেন যে, মুক্তি তুমি চেয়েছ, মুক্তির ছাড়পত্র আমার হাতের মুঠোয়। পেলে তবে তো যেতে পারবে!

আজ অনেক দিন পরে রাখালবাবু আবার যেন প্রাণখোলা হাসি-হাসতে পারলেন। হো হো করে হেসে উঠলেন। অশোকেরও ভাল লাগছিল সাদাসিদে প্রকৃতির এই প্রৌঢ় মানুষটাকে। ইতিমধ্যে বনমালী কিছু-চা-জলখাবার নিয়ে এল। মনোরমা দরজার আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝেছিলেন যে, এই সেই ডাক্তার-পাত্র অশোক, যার সঙ্গে সরমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। এমন চমৎকার পাত্র তাঁদের মেয়ের ভাগ্যে হল না। মনে মনে খুবই কষ্ট পেতে লাগলেন তিনি।

অশোক রাখালবাবুর কথা ঠেলতে পারল না। সে কথা দিল যে, ও বেলা খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলবেলায় গাড়ীতে সে কলকাতায় ফিরবে।

কথায় কথায় অশোক রাখালবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আপনার মেয়ের কি কোথাও বিয়ে দিয়েছেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাখালবাবু বললেন, কোথায় বা আর তার বিয়ে দেব, বাবা? খোঁড়া মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে বলে গায়ে-হলুদ হয়ে যাওয়ার পর অন্যের হাতে

তো ও মেয়েকে তুলেও দেওয়া যায় না! হিন্দু শাস্ত্রে তো তেমন বিধান কোথাও নেই।

—তাহলে আমার প্রার্থনা যে, ও মেয়েকে আপনি আমাকেই সম্প্রদান করুন, অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

—তুমি এখনও আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী আছ, বাবা? তুমি আমাকে বাঁচালে, অশোক। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, উদারচেতা যুবক। তোমার মতো জামাই পাওয়া আমার মতো মানুষের পক্ষে ভাগ্যের কথাই। আমি তোমায় আশীর্বাদ করি, অশোক, মানুষের সুখ-দুঃখের কথা মানুষের মন নিয়ে চিরদিন তুমি এমনি করে বুঝে তাদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে যেন পার।

অশোক উঠে রাখালবাবুর পদধূলি নিতেই মনোরমা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সব কথা তিনি শুনেছেন। তাঁর চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করছে।

অশোক তাঁকেও প্রণাম করল।

রাখালবাবু বললেন, তাহলে এবার শুভদিন স্থির করবার জন্যে দাদাকে খবর পাঠাই?

—তাঁকে আমি আজই খবরটা দিয়ে দেব'খন।

—তবে একটা কথা।

—আদেশ করুন।

—এ অবস্থায় সরমার মতটাও একবার নেওয়ার দরকার।

মনোরমা বললেন, মতামতের কি আছে? সে তো অশোকের বাক্‌দত্তা স্ত্রী। এখন কি তার বিয়েতে অমত করা ধর্মসঙ্গত, না আইনসম্মত?

—তুমি বুঝছ না, গিন্নী। সে যদি সুস্থ থাকত, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করবার কোন প্রয়োজনই আমি বোধ করতাম না। কিন্তু এখন তার কথা আলাদা। বড্ড অভিমানী মেয়ে সে। আমি তো জানি!

অশোক একটু হেসে সমস্যাটাকে হালকা করবার চেষ্টা করে বলল, তার মতামতের ভার আমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। তার সঙ্গে আমি নিজেও এ বিষয়ে একটু বোঝাপড়া করে নিতে চাই।

—সেই ভাল!

রাখালবাবু যেন পুনর্জীবন লাভ করলেন। সারাটা দিন বড় আনন্দে তাঁদের কাটল। বিকেলে বিদায় দেবার সময় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অশোককে বারবার আবার আসবার জন্তে অনুরোধ করলেন। অশোকও সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

তার চলে যাওয়ার সময় সরমা জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখল। তার উদারতার কিছু কিছু কথা তার কানেও ভেসে এসেছে। মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে সে পারল না। এমন মন না হলে আবার পুরুষ মানুষ? তবু বিয়ে করার প্রশ্ন তার মন থেকে সে অনেকদিন আগেই বিদায় করে দিয়েছে। সে জানে যে, মেয়েদের রূপ না থাকলে পুরুষমানুষের ভালবাসা পাওয়া দুষ্কর। তার মতো খোঁড়া মেয়েকে কোন পুরুষই যে যোল আনা ভালবাসা দেবে না, সে-কথা সে জানে। সে আরও জানে যে, স্বামীর ভালবাসা সম্বল করেই মেয়েরা স্বামীর ঘর করে, তাই সেখানে এতটুকু কার্পণ্য থাকলে তাদের জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তেমনি ব্যর্থ জীবন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে এই পংগু জীবন বয়ে বেড়ানো সরমার পক্ষে অনেকখানি বেশী সহজ। তাই বিয়ে করা নিয়ে সে আদৌ আর মাথা ঘামাতে চায় না।

॥ দশ ॥

নিখিল পথে পথে আরও কয়েকদিন ঘুরে প্রায় পাগলের মতো হয়ে আবার এসেছে নন্দনপুরে। সে যেখানেই গেছে, সেখান থেকেই পেয়েছে ঘৃণা অপমান বিদ্রুপ—সর্বোপরি মিথ্যে সন্দেহের স্ফুলিঙ্গ-জ্বালা। মনটা তার তাই আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সরমার ঘৃণার কথা ভেবে। যেমন করেই হোক সে সরমাকে বিশ্বাস করাবেই যে, সে নিরপরাধ। সংবাদপত্রে যা ছাপা হয়েছিল তার সম্বন্ধে, তা ভুল। নন্দনপুরের সবাই যা জানে, তা মিথ্যে। আর সরমা যা বিশ্বাস করে, তার সবটুকুই ভিত্তিহীন।

নিখিল গভীর রাত্তিরে বড়বাবুর কোয়ার্টারের দরজায় গিয়ে আঘাত করে ভাঙা ও চাপা কণ্ঠে ডাকতে লাগল, বড়বাবু বড়বাবু!

জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে রাখালবাবু বললেন, কে?

—আমি নিখিল, বড়বাবু!

বাগানটার ভেতর দিয়ে জানলাটার কাছে এগিয়ে গেল নিখিল।

রাখালবাবু আবছা আলোয় নিখিলকে দেখলেন। পাগলের মতো চেহারা। ছেঁড়া জামা-কাপড় পরণে।

—এত রাত্তিরে তুমি কি চাও?

—বড়বাবু, সরমা কি এখনও আমায় সন্দেহ করছে? একটু বলুন-না আমায়?

—নিখিল, তুমি বরং এখন যাও!

সরমা হয়তো এত রাত্তিরেও জেগে শুয়ে ছিল। রাখালবাবুর গলা শুনে সে তার ঘর থেকে জিজ্ঞেস করল, ওখানে কে কথা কইছে, বাবা?

—নিখিল এসেছিল!

—কেন, আবার কেন এসেছে?

মনোরমাও ঘুমোন নি তখনও। তিনিও তাঁর খাটে অন্ধকারের ভেতর শুয়ে শুয়েই বললেন, হ্যাঁগো তুমি, এত রাত্তিরে আবার সে হতচ্ছাড়াটা এসেছে কেন, শুনি ?

—নিখিল, তুমি যাও—

—কিন্তু বড়বাবু, সরমা যে কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না ?

—নিখিল তুমি চলে যাও, এত রাত্তিরে এখানে গোলমাল কর না। এটা ভদ্রলোকের পাড়া—সবাই সব বাড়ীতে ঘুমোচ্ছে, বিশ্রাম করছে—তুমি যাও—

—বড়বাবু, আপনিও শেষে বললেন যে, এটা ভদ্রলোকের পাড়া, তার মানে আমি ইতর ? সরমা আমায় বলে, খুনী। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি !

সেই অন্ধকারের মধ্যে নিখিল বেরিয়ে গেল। রেল লাইন পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ষ্টেশনের প্লাটফমের ওপর উঠল। ভারি তেষ্টা পেয়েছে তার। কল থেকে জল পান করল। নির্জন ষ্টেশন। গভীর রাত। কোথা থেকে যেন একটা কুকুর এসে তার পাশে বসল। সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কুকুরটা ক্রমে তার অনুগত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে সেখানে সে বসে রইল। বুকের ভেতর একটা অসহ্য জ্বালা সে অনুভব করতে লাগল। বিস্বাদ অধর বার কয়েক দংশন করল। হাত দুটো জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে আকাশের দিকে ব্যাগ্র দৃষ্টিতে একবার তাকাল। নীল আকাশের বুকে শুকতারাটাকে বেশী জলজলে বোধ হচ্ছে।

নিখিল উঠে দাঁড়াল। তারপর রেল লাইন ধরে উদ্দেশহীনভাবে হাঁটতে সুরু করল। সিগন্যাল কেবিনে ডিউটি করছে এ. এস. এম. ও তার কেবিনম্যান। সে থমকে দাঁড়াল। দেয়াল ঘড়িতে বারটা বেজে পাঁচ মিনিট। নীচেয় দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ কেবিনটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এখানে সে এবং দয়ারাম কত বছর ধরে ঐ রকম করেই ডিউটি করছে। এ. এস এম. চেঁচিয়ে আদেশ দিল কেবিনম্যানকে, দুশো বাইশ আপ্ থ্রু ট্রেন—তিন নম্বর ক্লিয়ার—

নিখিল চমকে উঠল। দুশো বাইশ আপ্ থ্রু ট্রেন—এখন এত

দেরীতে আসছে ট্রেনটা? ট্রেনের সময়ের পরিবর্তন হয়েছে তাহলে? কিন্তু এই থ্রু ট্রেন—যে তার জীবনে এনে দিয়েছে কলঙ্কের পসরা, প্রতিটি মানুষরে কাছে প্রমাণ করেছে তাকে ইতর বলে, এই বিশেষ ট্রেনটাই তাকে আজ পাগল করে তুলতে চলেছে।

দূরে—অনেক দূরে দেখা যায় ইঞ্জিনের হেড লাইট। লাইটটা ক্রমশঃ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। নিখিলও চলতে সুরু করল রেল লাইন ধরে। মনে মনে সে নিদারুণ আক্রোশ পোষণ করতে লাগল ঐ ইঞ্জিনটার প্রতি। সে ঐ ইঞ্জিনটাকেই তার পরম শত্রু বলে মনে করল। সিগন্যালের সবুজ আলো জ্বলছে। ট্রেনটা খুব জোরে পাগলের মতো ছুটে আসছে সামনের দিকে—নিখিলেরই কাছে।

সে দাঁড়াল। লাইনের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কঠিন ও রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইঞ্জিনের তীব্র হেড লাইটার দিকে। ঐ হেড লাইটের ভেতর সে যেন সরমার ক্রোধান্ধ চোখের প্রতিফলনই দেখতে পেল। তার মাথার মধ্যে পাক খেয়ে উঠল পাঁচ বছর আগেকার সেই কলঙ্কময় ট্রেন দুর্ঘটনার বিশেষ রাতটির বীভৎস দৃশ্যগুলো। বিরাট ইঞ্জিনটা উল্‌টে পড়ে গিয়েছিল আর খণ্ড-বিখণ্ড বগিগুলোর বিধ্বস্ত দৃশ্যের সঙ্গে মিশে ছিল অগণিত স্ত্রী-পুরুষের আর্ত চীৎকার। আজ সে তার সামনে পেয়েছে সেই দুশো বাইশ আপ ট্রেনটাকে—যে নিখিলের জীবনের এত বড় কলঙ্কের সব চেয়ে বড় সাক্ষী—আজ সে জবাব দিয়ে যাক্ সরমার সন্দেহের—আজ তাকে নিখিল হাতের মুঠোয় পেয়েছে।

উন্মাদ মানুষটা হো হো শব্দে চীৎকার করে অট্টহাসি দিয়ে উঠল! ট্রেনটা তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। ট্রেনের সঙ্গে তার হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল। শক্ত হয়ে এবার সে রুখে দাঁড়াল বিরাট ইঞ্জিনটার দিকে। অনর্গল চেঁচিয়ে আবোল-তাবোল কত কি যে সে ইঞ্জিনটাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, তার ঠিক নেই।

—তুমি জানো—তুমি সেই দুশো বাইশ আপ ট্রেন—তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও—তোমাকে বলতেই হবে, আমি কি অপরাধ করেছি, আমি কতটুকু দোষী—বলো—বলো—বলতেই হবে—আঃ—

ট্রেনটা ততক্ষণে এসে পড়েছে উন্মাদ মানুষটার গায়ের ওপর। ট্রেনের গতি ড্রাইভার কমাতে কমাতে একেবারে থামাতে না পেরে সজোরে

ধাক্কা দিল নিখিলকে। সে ছিট্‌কে পড়ল অদূরে। ট্রেনটা থেমে গেল।

হেড লাইটের আলোয় লাইটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা নিখিলকে ড্রাইভার দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল বলেই গাড়ীর গতি কমাতে পেরেছিল। তাই নিখিলের প্রাণটা বেঁচে গেল। কিন্তু মাথা কেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। তার জ্ঞানহীন দেহটা লাইনের পাশে পড়েছিল। ইঞ্জিনের হুইসেলে বিপদসূচক ধ্বনি জানানো হল। ষ্টেশন নিকটেই। তাই সেখান থেকে লোকজন ছুটে এল।

ট্রেনের ড্রাইভার গার্ড ফায়ারম্যান প্যাসেঞ্জারেরা—সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়াল নিখিলের জ্ঞানহীন আহত দেহটাকে ঘিরে। তারা নিখিলের দেহটাকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল ষ্টেশনের দিকে। ছুটে এল লক্ষ্মণ সিং। সে সনাক্ত করল, এ যে আমাদের পাগলা ছোটবাবু!

নিখিলকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

॥ এগার ॥

সেই গভীর রাত্তিরে লক্ষ্মণ সিং ছুটতে ছুটতে রাখালবাবুর কোয়ার্টারে গেল।

—বড়বাবু, সর্বনাশ হইয়েছে।

—কি ব্যাপার, লক্ষ্মণ?

—পাগলা ছোটবাবুর এক্‌সিডেন্‌ হইয়েছে।

—সে কি রে? ট্রেনে কাটা পড়েছে?

—ইঞ্জিনমে ধাক্কা লাগিয়ে এক্‌সিডেন্‌ হইলো। হাসপাতালে লইয়ে গেল সুখদেও, পতিতপাবন আউর টিকেটবাবু।

—তুই যা, আমি এখুনি আসছি।

লক্ষ্মণের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল বাড়ীর সবার। সরমা শুনতে পেয়েছে এক্‌সিডেন্টের কথা। শিউরে উঠল।

সে ভুল শুনছে না তো?

যেমনভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবেই লক্ষ্মণ সিং ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

—কার এক্‌সিডেন্ট হয়েছে, বাবা?

—নিখিলের।

—মরেছে? মরবে না? পাঁচ বছর ধরে প্রতি মুহূর্তে তাকে আমি অভিশাপ দিয়েছি। ঘোর পাপীর শাস্তি ভগবান দিয়েছেন — ভগবান আছেন—

—ছিঃ মা, নিজেকে ছোট করিস্‌ নে। তোর ভাগ্যে দুঃখ ছিল, তাই পেয়েছিস। তাই বলে সে-অপরাধ অপরের ঘাড়ে চাপাস্‌ নি। আমার তো বরাবরই মনে হয়েছে যে, ছেলেটা নির্দোষ। বিনা অপরাধে তার জেল হল, জেল থেকে বেরিয়ে পাগল হল, তারপর মরতে বসল! শুধু তোর মুখ থেকে সে যে নির্দোষ, এই সামান্য কথাটুকু শোনবার জন্যে এতদিন ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। হয়তো এতক্ষণে তার প্রাণটাই বেরিয়ে গেছে। তার জীবিত অথবা মৃত আত্মার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, মা!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সরমা তার বাবার আন্তরিকতাপূর্ণ কথাগুলো শুনতে শুনতে অশ্রুসজল হয়ে উঠল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে আঁচলে মুখ ঢেকে বলল, তোমরা আমায় কেউ বুঝলে না, বাবা,—কেউ বুঝলে না।

রাখালবাবু মেয়ের দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন, আমি সব জানি, মা,—সব বুঝি!

এমন সময় উন্মাদপ্রায় অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে দয়ারাম এসে উপস্থিত হল। বাড়ীর ভেতর ঢুকেই 'বড়বাবু' বলে কেঁদে উঠোনে বসে পড়ল।

—তুই বেঁচে আছিস, দয়ারাম?

—এ ঘোর পাপীকে ভগবান কেন যে বাঁচিয়ে রাখলেন, তাই ভাবি। আমার সব গেছে, বড়বাবু, সব গেছে। আমার যে ছেলে-বৌয়ের জন্যে ছোটবাবু জেল খাটলেন, কত কষ্ট পেলেন, তাদের বাঁচাতে পারলাম না। তিন দিনের কলেরায় মরে গেল। হবে না এমন? আমি যে পাপী, বড়বাবু?

—কেন, কি এমন গর্হিত কাজ তুই করেছিস?

—বড়বাবু, আপনারা সবাই জানেন, দশে-ধর্মে জানে যে, ছোটবাবু একসিডেণ্ট ঘটালেন, কিন্তু ভগবান জানেন, ছোটবাবু নির্দোষ! আমি—বড়বাবু, আমি নিজের হাতে ভুল সিগন্যাল টেনে একসিডেণ্ট করিয়েছি। ছোটবাবু তো সেই রাত্রে মেঝেয় শুয়ে জ্বরে ছটফট করছিলেন। সঠিক জ্ঞানও বোধ করি তাঁর ছিল না। আমিই কেবিনের সব কাজ করছিলাম। ছোটবাবু শুয়ে থেকেই আমাকে তিন নম্বরের ক্লিয়ার দিতে বললেন। কিন্তু আমি তখন মুগ্ধ হয়ে প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সেখানে তখন আপনি দিদিমণি মামাবাবু—আরও কত লোকজন আর একবার তাগাদা দিলেন ছোটবাবু, লাইন ক্লিয়ার দেবার জন্যে। তখন তাড়াতাড়ি ঝোঁকের মুখে দু নম্বরে ক্লিয়ার দিলাম আমি নিজের হাতে। এই খুনী পাপী হাতখানা, ইচ্ছে হয়, কেটে ফেলি! এই হাতখানা দিদিমণির অত বড় ক্ষতি করল, কত যাত্রীর কত প্রাণ কত সম্পত্তি নষ্ট করল, ছোটবাবুকে কোথায় নামিয়ে দিল।

—শুনলি তো সব, মা? এখনও কি তোর বিশ্বাস হয় না যে, নিখিল নির্দোষ?

সরমা তখনও কাঁদছে। তার সারা মন অশ্রুসাগরে ডুবে রয়েছে। দয়ারামের দুঃখের কাহিনী, নিখিলের আত্মহত্যা—সবকিছুর সাথেই যে মিশে রয়েছে তার পংগু জীবনের চরম ব্যর্থতা! সে আরও কাঁদছে। খুব কাঁদছে। কথা বলার শক্তিও বুঝি সে হারিয়েছে। রাখালবাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিজেও একটু বিচলিত হয়ে পড়েন।

—তুই যাবি আমার সঙ্গে হাসপাতালে ?

সরমা আস্তে আস্তে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। তারপর কাঠের পায়ে ভর দিয়ে চলতে চেষ্টা করল। রাখালবাবু তাকে ধরে ধরে চলতে লাগলেন।

দয়ারাম চোখের জল মুছে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন, বড়বাবু, এত রাত্তিরে ?

—হাসপাতালে। তোর ছোটবাবুকে দেখতে।

—হাসপাতালে ? কেন, ছোটবাবুর কি হয়েছে ?

—এক্সিডেণ্ট !

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ! তার মাথার গোলমাল হয়েছে। রেল লাইনের থ্রু ট্রেনের সামনে হয়ত গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। লক্ষ্মণ সিংহের কথাও খুব স্পষ্ট নয়।

—চলুন, আমিও যাব! দোষ করলাম আমি, আর শাস্তি পেলেন ছোটবাবু। ভগবানের এমন একচোখা বিচার তো কখনও দেখি নি, বড়বাবু! এমন কেন হল ?

—অমনটিই এ জগতে ঘটে। ভাল মানুষেরাই চিরকাল ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে মরে। তাদের কপালেই দুঃখের টীকা আঁকা থাকে।

॥ বার ॥

কাঠের পায়ে ভর দিয়ে এতটা পথ চলা কি সহজ কথা? দুর্ঘটনার পর এতটা পথ একটানা কোনদিন সরমা হাঁটে নি। হাঁটার প্রয়োজনও তার হয় নি। রাখালবাবুর হাত ধরে এক একবার সে দাঁড়িয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছে। আবারও একটু একটু করে চলতে সুরু করছে। আর কত পথ বাকি? এ পথের শেষ কখন হবে? হাসপাতালটা যেন এই কয়েক বছরে অনেক দূরে সরে গেছে। সরমা যেন হাসপাতালের এই পথটাও প্রায় ভুলে গেছে। অথচ তার ছোটবেলায় এক ছুটে এক নিঃশ্বাসে কত দিন সে এই হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছেচে।

আবারও একটুক্ষণ থামতে হল। পায়ে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

রাখালবাবু বললেন, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, মা! তুই বরং ঘরে ফিরে চল।

নিজের করুণ চোখ দুটো তুলে ধরল সরমা বাবার মুখের দিকে। কোন কথা বলার শক্তিটুকুও তার যেন আর অবশিষ্ট নেই। রাখালবাবু আর কোন কথা বলতে পারলেননা। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হল, জীবনযুদ্ধে বাররার তিনিও যেন নিজের কাছে হেরে যাচ্ছেন। দুর্ভাগ্য শুধু নিখিলেরইনয়, তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষেরও বটে! তাঁর চোখ দুটোও বুঝি আকস্মিকভাবে ছলছল করে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়ের হাত ধরে আবার চলতে সুরু করলেন।

পেছনে পেছনে চলছে দয়ারাম। সেও অঘোরে কাঁদছে। শোকে অনুতাপে মমতায় তার সারা মনটা রীতিমত আন্দোলিত ও বিধ্বস্ত। মুখে বিড়বিড় করে শুধু বলছে, হে ভগবান, ছোটবাবুকে ভাল করে দাও। আমাকে শাস্তি দাও। হে ভগবান—হে ভগবান—

পথ চলতে চলতে সমুমার মনটা চলে গিয়েছিল কয়েক বছর আগেকার নন্দনপুরের মাটিতে, যেদিন সে প্রথম দেখেছিল নিখিলকে। তারপর কটা বছর কেমন করে যে কেটে গেছে, তার হিসেব মেলানো কঠিন। একটু একটু করে সে নিখিলের কত কাছে চলে গিয়েছিল। তারপর নিয়তির চক্রান্তে আজ সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

না। আর ভাবতে পারা যায় না। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে ওঠে। বড় দুর্বল বোধ হয় নিজেকে। তবু—তবু তাকে চলতে হবে। হ্যাঁ পিছিয়ে থাকলে চলবে না। নিখিলের সব কথা শুনতে হবে। কত কথা যে তাকে বলতে হবে, তার ঠিক নেই।

সার্জিকাল ওয়ার্ডের সতের নম্বর বেড।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিখিলের জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফিরে পেয়েই আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করে কি যেন সে বলছে।

কান খাড়া করে ডাক্তার তার কথাগুলো অনুধাবন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। চোখের পাতা দুটো বোজা। হাতের আংগুলগুলো মাঝে মাঝে সঞ্চালন করছে। আর 'আঃ—উঃ' শব্দে কাতরাচ্ছে, কখনও-বা বকছে। একবার বলল, জ—ল!

নার্স তৎক্ষণাৎ একটু জল তার ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিল।

রাত বাড়ছে।

নিখিলের মাথার ক্ষত স্থানগুলো সেলাই করা সমাপ্ত হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। এত বেশী রক্তক্ষয় হাসপাতালে আসবার আগেই হয়েছে যে, প্রাণের আশঙ্কা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাক্তারটি ও নার্সটি প্রতীক্ষা করছেন রোগীর কোন পরিবর্তন হয় কিনা, তাই দেখবার জন্যে।

নিখিল পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করতে গেলে নার্সটি ছুটে এসে তাকে ধরে আস্তে আস্তে তেমনটি করে শুইয়ে দিল। অস্ফুট কাতর স্বরে নিখিল বলল, স্ব—র্ণ! স্ব—র্ণ—ম—য়ী! তুই এসেছিস্, বোন! এত দিন কোথায় লুকিয়ে ছিলি, বল তো? তোকে যে খুঁজে খুঁজে আমি

হয়রান হয়ে গেছি। আর পারি না। আ—য়! আমার কাছে এসে একটু বোস্, লক্ষ্মী বোনটি আমার। বড় কষ্ট! বড় কষ্ট!! একটু জ—ল!

নার্স'টি তাড়াতাড়ি একটু জল এনে আবার নিখিলের ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিল। চোখ দুটো বুজিয়ে ভ্রু-টা ঈষৎ কুঁচ্‌কে নিখিল বলল, আ—লো চাই! আ—শা চাই!!

নার্স'টি ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারকে ডাকল।

—রোগী প্রলাপ বকছে। গায়ের জ্বর বেড়েছে বলে বোধ হচ্ছে। আপনি একটু দেখবেন কি?

—নিশ্চয়ই! থার্মোমিটারটা দিন!

তাপ পরীক্ষা করে নাড়ী পরীক্ষা করে ডাক্তার ডাতাড়াতাড়ি একটা ইনজেক্‌সান দিলেন নিখিলকে। তখনও নিখিল গলার স্বর টেনে টেনে বলে চলেছে—আলো চাই, আলো চাই, আলো—

এর পরেই অকস্মাৎ একটা কর্কশ চীৎকার করে থেমে গেল নিখিল। আর তার কোন সাড়া-শব্দ রইল না কিছুক্ষণের জন্যে। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত আরও বেড়েছে। হাসপাতালের আবহাওয়া অনেকটা শান্ত হয়ে উঠেছে। একটু তন্দ্রার মতো নিখিলের ইতিমধ্যে এসেছিল। আবার তার যেন ছন্দপতন ঘটেছে

নিখিল ছটফট করছে। তার মাথার ব্যাণ্ডেজ চুইয়ে তখনও রক্ত ঝরছে হয়তো। শাদা ব্যাণ্ডেজটার গায়ে রক্তের দাগ। আর সর্বাঙ্গ শাদা কাপড়ে ঢাকা। ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে তাপ নিচ্ছেন। আর একটা ইনজেকশন দিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে।

ভাঙা গলায় খুব টেনে টেনে নিখিল হঠাৎ একবার ডাকল, ডাক্তারবাবু!

—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, জানি। চুপটি করে ঘুমোনোর চেষ্টা করুন।

ডাক্তার নিখিলকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে গিয়ে তার চোখে-মুখে

প্রত্যক্ষ করলেন উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি। তিনি তার মুখের কাছে মুখটি এগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমায় কিছু বলবেন? আচ্ছা, আস্তে আস্তে বলুন। আমি শুনছি।

নিখিলের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কথা বলতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু অনেক কষ্টে দম নিয়ে থেমে থেমে সে বলতে লাগল, ডাক্তারবাবু সরমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে, আমি তাকে খুব ভালবাসি। কাউকে ভালবাসলে, তার কোন ক্ষতি করতে যে মন চায় না, এই সামান্য কথাটা সরমা বোঝে না।

—সত্যিই তো, এ তাঁর ভারি অন্যায়।

—এই তো, আপনি ঠিক বুঝেছেন? ডাক্তারবাবু, এক্সিডেণ্ট আমি করাই নি, বিশ্বাস করুন!

—হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি কিছুতেই এক্সিডেণ্ট করাতে পারেন না। তেমন নীচ মন আপনার নয়।

—সত্যি বলছেন? আমি করাই নি তো?

একটু সহানুভূতি, সামান্য সমর্থন ও তিলমাত্র সমবেদনা পেয়ে নিখিল কৃতজ্ঞতা বোধ করতে লাগল ডাক্তারের প্রতি। ডাক্তার যে তাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে চিকীৎসা করছেন, তা সে জানবে কেমন করে? ডাক্তারের স্পষ্ট উক্তির কষ্টিপাথরে এত দিনের মিথ্যে কলঙ্ককে সে যেন যাচাই করে নিতে চাইল। এত মানুষের মুখে শোনা মিথ্যে কলঙ্কের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে বেড়ালেও তার নিজের মনের মধ্যে সেই মিথ্যেটা হয়তো দানা বেঁধে ধীরে ধীরে সত্যি হয়ে উঠছিল। তাই নিজের সম্বন্ধেও আজ তার সংশয় জেগেছে। আর সেই সংশয়ের বশবর্তী হয়ে সে এই তৃতীয় ব্যক্তি ডাক্তারটির কাছ থেকে আর একবার শুনতে চায় তার নিজের কথা।

ডাক্তার জোর দিয়েই বললেন, না না, আপনি কখনই এক্সিডেণ্ট করান নি।

—উঃ, ডাক্তারবাবু, আপনি আমাকে বাঁচালেন। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রনা বোধ হচ্ছে, ডাক্তারবাবু! চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি নে। কেন এমন হচ্ছে? শুধু শুধু একটা বিরাট ইঞ্জিন—সেই বিরাট ইঞ্জিনটা তার তীব্র হেড লাইট ফেলে হাজারটা সিগন্যাল পার হয়ে ঝড়ের মতো

ছুটে আসছে। অফুরন্ত আলো—সহ্য করতে পাচ্ছি না—আমার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে আলোর বন্যায়—এত আলো চাই নে—আলো চাই নে—না—না— না—না…

আর্তনাদ করে উঠেই নিস্তেজ হয়ে গেল নিখিলের দেহটা। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠে ইন্‌জেক্‌সানের সিরিঞ্জ আনবার আগেই শিথিল হয়ে গেছে রোগীর দেহটা। ডাক্তার নাড়িটা পরীক্ষা করে থমকে দাঁড়ালেন মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁর পেছনে নার্সটিও হতবাক্‌ হয়ে রয়েছে। এমনি করে সারা জীবন ধরে আলোর প্রার্থনা করে জীবনের শেষ মুহূর্তে অফুরন্ত আলো পেয়েও নিখিল তা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেল।

এমন সময় সরমা রাখালবাবু ও দয়ারাম এসে ঢুকল সেখানে। সরমা এতটা পথ এক পায়ে হেঁটে এসে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে বলতে সে ঘরে ঢুকেছে—আমি এসেছি। তোমার সব কথা আজ শুনব, নিখিলদা, তোমার সব কথায় আজ জবাব দেব। কথা কও—কথা কও—

—আর কোন দিনই উনি কথা বলবেন না। ব্রেণ ফেল করে এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে—

– কিন্তু আমার যে অনেক কথাই ওকে বলবার ছিল ?

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিখিলের মৃত ফ্যাকাসে মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে মর্মভেদী আর্তনাদ করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল সরমার পংগু দেহটা।

ডাক্তার জানলার শার্সিটা খুলে দিলেন। ভোরের আলো এসে ঘরে প্রবেশ করল। ডাক্তার ও নার্সকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে রাখালবাবু ও দয়ারামকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মেঝের ওপর অনেকক্ষণ ডুকরে ডুকরে কাঁদার পর সরমা মুখ তুলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই হাত বাড়িয়ে তাকে উঠতে সহায়তা করল

অশোক। কখন কোথা থেকে কেমন করে যে সে এখানে এসে এমনটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে কথা আদৌ ভাববার মতো মনের অবস্থা তখন সরমার ছিল না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেই অশোক তাকে দু হাতে কাছে টেনে নিল। ততক্ষণে সে হয়ত অনেকটা শান্ত হতে পেরেছিল।

পাশাপাশি দুজনে দাঁড়িয়ে মৃতের মুখের দিকে নিরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ভোরের আলো তখন ঘরখানার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

দুজন নার্স এসে একখানা শাদা কাপড়ে নিখিলের দেহটা আবৃত করে দিয়ে গেল

সরমার পিঠে মৃদু স্পর্শ করে অশোক বলল, এবার চল।

শূন্য দৃষ্টিতে সরমা অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এক পা-ও সেখান থেকে নড়ল না।

অশোক সেদিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে পারল না।